

এবং প্রান্তিক

An International Research Referred Journal

DIIF Approved Impact Factor : 1.12

Issue 2nd Vol. 6th May, 2015

সম্পাদক

আশিস রায়



 EBONG PRANTIK

Ebong Prantik

An International Research Referred Journal

Editorial Board

**Executive Editor**- Prof.Bratati Chakravarty.

**Editor-** Ashis Roy.

**Co-Editor**-Tumpa Bapari, Asish Kr.Sau, Sujay Sarkar.

**Advisory Board** – Subal Kumar Maity, Bibhabasu Dutta, Biswajit Karmakar, Soma Mukherjee, Akash Biswas, Suvojit Dutta, Tapaskumar Sardar, Mrinmoy Paramanik, Md.Intaj Ali, Mohankumar Mayra.

**Expert Members**-

Dr.Alok Ranjan Dasgupta (Hedelberg University)

Dr.Achinta Chatterjee (California University)

Dr.Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals,Boston)

Dr.Manas Majumdar (Calcutta University)

Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)

Dr.Sambhunath Bandyopadhyay (Burdwan University)

Dr.Tania Hossain (Waseda University)

Dr.Soumitra Shekhar (Dhaka University)

Dr.Aloka Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Namita Bhattacharya (Banaras Hindu University)

Dr.Prakash Kumar Maiti (Banaras Hindu University)

Dr.Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Soumitra Basu (Rabindra Bharati University)

Dr.Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)

Dr.Samaresh Debnath (Dhaka University)

Dr.Bhuina Iqbal (Chattagram University)

প্রচ্ছদ শিল্পী- আরাধনা দাস।

 \* লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোন অংশের কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

সূচীপত্র

|  |  |
| --- | --- |
| বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ / ডঃ ব্রততী চক্রবর্তী | ১-১০ |
| কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী/ ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায় | ১১-১৭ |
| হুমায়ুন আজাদের কবিতা : আবেগের সৃষ্টিশীল রূপ / মামুন রশীদ | ১৮-৩8 |
| শকুন্তলা : থীম পরম্পরা / ডঃ ঋতম মুখোপাধ্যায়  | ৩৫-৪৬ |
| শুধু ‘সহোদরার’র জন্যই যে কবিতাটি / ড. আকাশ বিশ্বাস | ৪৭-৫২  |
| বঙ্গদেশে থিয়েটারের সূচনাপর্বে বিদেশিদের প্রভাব / গৌতম মণ্ডল  | ৫৩-৬৪ |
| দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত : প্রসঙ্গ হাস্যরস / আশীষকুমার সাউ | ৬৫-৭০ |
| সোহাগিনীর সঙ্গে এক বছর : আত্মপ্রকৃতিতে বিশ্বরূপ / টুম্পা ব্যাপারী | ৭১-৮০ |
| মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দূতীর প্রভাব / জয়ন্ত মণ্ডল | ৮১-৯২ |
| সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ / আশিস রায় | ৯৩-৯৭ |
| কালবেলার অনিমেষ : অনিমেষের কালবেলা / সঞ্জীবন মন্ডল | ৯৮-১১২ |
| *শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ও সমকালীন বাঙালী সমাজ /* নির্মল বন্ধু দাস | ১১৩-১২৪ |
| সাদাত হাসান মান্টো’র রচনায় দেশভাগ ও দাঙ্গা : গল্প যখন ইতিহাস / অনুপম সরকার | ১২৫-১৩২ |
| ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্য / আশিস রায় | ১৩৩-১৪০ |
| গ্রন্থ-আলোচনায় জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে...ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায় | ১৪১-১৫১ |
| AESTHETIC, SOCIAL AND MYTHIC CONSCIOUSNESS IN THE POETRY OF AUROBINDO GHOSE AND S.L.PEERAN/ MASHRIQUE JAHAN | 152-163 |
| KARMAPA LAMA AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/Dr. Malvika Ranjan | 164-171 |
| EFFECT OF POVERTY AND IGNORANCE ON THE POLLING OPINION OF THE PEOPLE / Aiswarya Maity | 172-173 |

সম্পাদকীয়

দোষটা দিতেই পারতাম। কিন্তু যখন প্রশ্ন ওঠে বলির পাঁঠা কাকে বানাবো, তখন আঙুলটা আর কারো দিকে না তুলে নিজের দিকে তোলাই ভালো। তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম, পত্রিকার মানটা বজায় থাকুক আর ওজনটা কমুক।

বাংলাদেশে পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সব থেকে বেশি সাহায্য করেছেন, ঢাকার দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকার সহ-সম্পাদক মামুন রশীদ। পত্রিকা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে অনেক ধন্যবাদ। এ বারের পত্রিকাটিও পাঠক সাদরে গ্রহণ করবেন আশা রাখছি।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ

 ডঃ ব্রততী চক্রবর্তী

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

 ২১ ফেব্রুয়ারী, এই দিনে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক-জব্বার-বরকত-সলামসহ বহু ছাত্র, জনতা, ১৯৫২ সালে। এই দিনটি তাই বাংলাদেশে শহীদ দিবস রূপে পালিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে যে প্রবল আন্দোলন বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল একুশের সূত্র ধরে, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে জন্ম হল বাংলা একাডেমীর (ডিসেম্বর ৬, ১৯৫৫) মতো প্রতিষ্ঠানের বাংলাচর্চার প্রাণকেন্দ্ররূপে যা স্পন্দিত হতে থাকল। আর এই বাংলা একাডেমীর ছত্রছায়ায় আরম্ভ হল একুশের বইমেলা, আজ যা পৃথিবীর দীর্ঘতম বইমেলা। একুশের জেরে একটা দেশ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা দিল, রবীন্দ্রনাথের গানকে করল জাতীয় সঙ্গীত। একুশের জেরে বাংলাভাষা পেল জাতিসংঘে স্থান। ২১ ফেব্রুয়ারী স্বীকৃত হল ‘আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস’ রূপে, তাই এই দিনটি খুবই তাৎপর্যময়।

 ২১ ফেব্রুয়ারী দিনটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের নাম, যে নাম বড় হতে হতে বাংলাদেশকে পরিব্যাপ্ত করেছে; অনেক বিরোধ-প্রতিরোধের, গ্রহণ-বর্জনের ঝঞ্ঝাঘাত পেরিয়ে বাংলাদেশের বাঙালির হৃদয়ে যে নাম স্থায়ী আসন লাভ করে নিয়েছে। তাই বাংলাদেশে রবীন্দ্র পরিক্রমা সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

 পিতা দেবেন্দ্রনাথের দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জমিদারী অঞ্চলের কাজ দেখাশোনার জন্য গ্রাম বাংলায় এলেন। শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পাতিসর নামের খালবিল নদীনালাসহ অখ্যাত গ্রামগুলিতে বসবাস করে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভূমিকে আবিষ্কার করলেন; অতিসাধারণ মানুষদের বাস্তব জীবনে তার প্রবেশ ঘটল। রাণী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখলেন-

‘বাংলাদেশের হৃদয়ে আমি প্রবেশ করেছি। দেখেছি, দেখিয়েছি সবাইকে তাদের নানা পুজো, পার্বণ, বিবাহ, উৎসব, ঘরকন্না। ...বিশ্বের রস আকর্ষণ করেছি লোকের চিত্ত থেকে, দেশের মাটি থেকে। অত্যন্ত সত্য যে, সে রকম করে আর কেউ তখন দেখেনি’ (-আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ)

 পদ্মা, ইছামতী, গোড়াইয়ের জলে ভেসে যেতে যেতে, বাংলাদেশের হৃদয়ে প্রবেশ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেললেন অসামান্য কতকগুলি ছোটগল্প, কালজয়ী সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি এবং আরও কটি কাব্যগ্রন্থ। অনিন্দ্যসুন্দর কতগান, মানবিক চেতনার গভীরে প্রবেশ করে কত নবীন আঙ্গিকের সৃষ্টি রসসম্ভার গড়ে তুললেন তিনি। বাঙালি জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখায় রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ পূর্ণতর হল। অন্যদিকে, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গান মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা প্রদান করল। হবে জয় হবে জয়; বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও; আমি ভয় করব না ভয় করব না; আমাদের যাত্রা হল শুরু; ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে; ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো ইত্যাদি অমোঘ প্রেরণাদায়ী সব গানকে আত্মিকরণ করে বাংলাভাষার জন্য জীবন দিল কত তরুণ প্রাণ; বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার জন্য ঝরল কত তাজারক্ত।

 পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা করার জন্য শাসক গোষ্ঠী প্রবলভাবে সচেষ্ট হয়। ১৯৪৮সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-প্রদর্শন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। এই পরিষদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বছরই মার্চ ১১, বঙ্গবন্ধুসহ বহু ছাত্র বাংলা ভাষার দাবীর কারণে গ্রেফতার হন। কিন্তু প্রবল জনআন্দোলনের ফলে তাঁদের মুক্তি দিতে হয়। ১৬ মার্চ ছাত্রসভায় পুলিশি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকার জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করায় ছাত্রারা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে। ১৯৪৮ সালের এই প্রতিবাদ ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে, বাংলাভাষার দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট, মিছিল, প্রতিরোধ চলতেই থাকে।

 ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী, প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর বিরুদ্ধে ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলাভাষার দাবীতে ঢাকায় বিশাল জন সমাবেশ হয়, সেখানে পুলিশের গুলিতে বহু মানুষ হতাহত হন। পরের বছর আওয়ামী লিগ সরকার গঠন ক’রে একুশে ফেব্রুয়ারীকে ‘শহীদ দিবস’ রূপে স্বীকৃতি দেয়, নির্মিত হয় শহীদ মিনার। দিনটি সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশে, একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালির জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, বাঙালি জাতির মেধা ও সৃজনশীলতাকে করেছে বিস্তৃত ও বিচিত্রগামী। ৫২-র ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি বাংলা একাডেমীকে (৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫) কেন্দ্র করে বাঙালির জাতিয়তাবোধ সুবিকশিত হয় এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়। মাতৃভাষার জন্য যে জীবন-উৎসর্গ করা যায়, তার অনন্য দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীকে দেখাল বাংলাদেশ। আর রবীন্দ্র-সৃষ্টিসম্ভার ছিল তাদের প্রেরণার উৎস। তবে বিগত শতকের ৪০-৫০-৬০-এর দশকে, বাংলাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার ফলে ও অপ-রাজনৈতিক বিকাশের কারণে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে, ফলে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে ওঠে। তাঁকেও এদের বিকৃতি ও অবিবেচনার শিকার হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের নিরবচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বের সাধনা, তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে পরিব্যাপ্ত মানবিক চেতনাকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা অনেক বুদ্ধিজীবীরও ছিল না। “বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চাঃ রচনাপঞ্জী” (১৯৮৬) বাংলা একাডেমী গ্রন্থে মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন-

 “দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা কেন্দ্রিক যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে, তা ছিল প্রধানত দুটি মতবাদে বিভক্ত। এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ ছিল উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের তথাকথিত জাতীয় সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে এঁরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন। কারণ এঁদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সনাতন কিংবা ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক। যা কিনা মুসলিম ধর্মবোধের পরিপন্থী; অতএব তিনি সাম্প্রদায়িক এবং বর্জনীয়। এটা ছিল তৎকালীন পাকিস্তানী সরকারের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি। তাই রবীন্দ্রচর্চার ওপর নেমে এলো বাধানিষেধ।

 এরই পাশাপাশি একদল আরও বুদ্ধিজীবি ছিলেন, যাঁদের সত্ত্বায় মুসলমানত্বের চেয়ে বাঙালিত্ব অধিক প্রবল ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এরা ছিলেন মোটামুটি আবেগবর্জিত, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তি নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রসমোক্ত গোষ্ঠীর বিকারগ্রস্ত মনোভাব দেখে এঁরা ধীরে ধীরে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫২ সালে বাঙালিকে রক্ত দিতে হয়। এই ভাষা আন্দোলনকে অবলম্বন করে অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। তারই পরিচয় মেলে ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপহন”।

 – ফলে প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রবীন্দ্র-বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পাল্টা সংগঠন তৈরী করেন। এই বিরোধিতার ফলে রবীন্দ্র অনুরাগী বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষরা আরও বেশি সক্রিয় হলেন। ডঃ গোলাম মুরশিদ তাঁর “রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গঃ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ” ( সং একা, ১৯৮১) গ্রন্থে বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা ও বিরোধিতার এই দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাস বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাসের মধ্যে দিয়েই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথই হয়ে উঠেছিলেন প্রধান হাতিয়ার। মহম্মদ আবদুল রজ্জাকের ভাষায়- “সংগ্রামী তরুণ সমাজ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই শুনতে পেয়েছেন নিজেদের আত্মার ধ্বনি। তিনি আপন শক্তিতে ঠাঁই করে নিয়েছেন বাংলাদেশের হৃদয়ে”। তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও সুরে, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠে, তাঁর গভীর মানবতা বোধে।

 ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দুই পক্ষের বিরোধ তুঙ্গে ওঠায় সামরিক সরকার রবীন্দ্র-বিরোধীদের পক্ষে থেকে নানা রকম চাপ সৃষ্টি করে, পত্র-পত্রিকাগুলিও বিশেষ সক্রিয় হয়। রবীন্দ্র-বিরোধিতার সুযোগ করে দেয় আজাদ, মর্নিং নিউজ পত্রিকা। আর রবীন্দ্র-পক্ষের সহায়ক হয় ইত্তেফাক পত্রিকা। কিন্তু ঢাকা এবং বাংলার অন্যান্য প্রান্তেও রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয় সব বিরোধিতাকে অস্বীকার করে প্রাণের তাগিদে। বাংলাদেশে ১৯৬১ সালের রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন রবীন্দ্র-চর্চার ধারাকে আরও গতিশীল করে। এ সময় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মোফাজ্জল হয়দার চৌধুরীর ‘রবি-পরিক্রমা’ (১৯৬৩), আনোয়ার পাশার ‘রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা’ ( প্রথম খণ্ড ১৩৭০), যোগেশ্চন্দ্র সিংহের ‘ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৪), আনিসুজ্জমান এর সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রনাথ’ (১৩৭৫), এবং সৈয়দ আকরম হোসেন-এর ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ দেশকাল ও শিল্পরূপ’ (১৯৬৯)। এঁদের মধ্যে নিষ্ঠাবান রবীন্দ্রপ্রেমিক আনোয়ার পাশা তাঁর ‘রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা’র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাকবাহিনী ও তার অনুচরদের দ্বারা নিহন হন।

 এ সব গ্রন্থে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি লেখকদের আন্তরিক অনুরাগের প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে তাঁদের প্রবল অনুসন্ধিৎসা পর্যবেক্ষণ-ক্ষম্‌তা, বিশ্লেষণী–শক্তি মুগ্ধ করে। আনিসুজ্জমান সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে সংকলিত ৩০টি প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সৃষ্টি কর্মের মূল্যায়ন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

 ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় বর্তমান বাংলাদেশে বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৬৭-তে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন ফরমান জারি করেছিলেন-

 “জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার করা হবে না”। এর বিরুদ্ধে ১৮ জন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন-

 “রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষীর সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য”। এই বিবৃতির বিরুদ্ধে পাল্টা বিবৃতি, আবার বিবৃতি চলতেই থাকে। এ সময় গোটা বাংলাদেশ রবীন্দ্র-অনুরাগে ও বীতরাগে প্রবলভাবে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পরই, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ এক স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা পেল। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংগ্রামী হৃদয়ের প্রেরণা ও শক্তির উৎস। রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা’ জাতীয় সঙ্গীতরূপে জনগণের গ্রহণীয় হল। অধ্যাপক শামসুজ্জমান খান লিখেছেন –“যে কবি ছিলেন আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, জাতীয়-সঙ্গীত স্রষ্টা হিসাবে তিনি চিরকালের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তারও অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেন”।

 বাংলাদেশে এখন রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জীবন সাধনারই অভিন্ন অঙ্গ। ছায়ানট, ঐক্যতান, রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, বুলবুল একাডেমী, বাংলা একাডেমীসহ বহু সংস্থা শ্রদ্ধায় ভালবাসায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী ও তাঁর তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন করে থাকেন। প্রাণের আবেগে রবীন্দ্র-চর্চা করে আসছেন তাঁরা। বাংলাদেশের বাঙালি, রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে বাঙালিত্বে দীক্ষা পেল আরও আত্মবিশ্বাসী হল। অধ্যাপক সানজীদা খাতুনের ভাষায়—‘স্বাধীনতার আসল অর্থ যে পরাশ্রয় ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, রবীন্দ্রনাথের এ শিক্ষা আমাদের অবলম্বন ও সাধনার বিষয় হয়েছে’। অবশ্য এই মনোভাবের বিপরীতে অতি বামেরা রবীন্দ্রনাথকে সামন্তবাদী জমিদারে পরিণত করাতে চেয়ে মসীযুদ্ধে নেবেছিলেন, কিন্তু সকল বিরোধের ঊর্ধ্বে থেকে বেশ কিছু রবীন্দ্র-অনুরাগী শিক্ষিত মানুষ পরম নিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সৃষ্টি কর্মের নিবিড় চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হল। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইয়ের নাম করা যেতে পারে-

 আহমদ হুমায়ুনের - বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ (১৩৮০)

 সৈয়দ আলী আহসান - রবীন্দ্রনাথঃ কাব্যবিচারের ভূমিকা (১৯৭৪)

 আহমদ রফিক - আরেক কালান্তরে (১৯৭৭)

 সৈয়দ আকরম হোসেন - রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ

 (১৩৮৮)

 সন্‌জীদা খাতুন - রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ (১৩৮৮)

 সিদ্দিকা মহমুদা - রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতাঃ চেতনা ও চিত্রকল্প (১৯৮১)

 গোলাম মুরশিদ - রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গঃ পুর্ববঙ্গে রবীন্দ্র চর্চা (১৯৮১)

 মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান - মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ (১৮৮৩)

 মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান - রবীন্দ্র প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য (১৮৮৩)

 আহমদ কবির - রবীন্দ্রকাব্যে উপমা ও প্রতীক

 মোহাম্মদ মণিরুজ্জমান - রবীন্দ্র-চেতনা (১৯৮৪) ইত্যাদি।

এ সকল গ্রন্থে লেখকেরা রবীন্দ্রনাথের যথাযথ মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন পরম নিষ্ঠায়।

 সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থগুলি সম্পর্কে রফিকুল্লাহ খান লিখেছেন—

“বিষয়বৈচিত্র্য ও জীবনানুভবের দিক থেকে বাংলাদেশের মননচর্চা কতোটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তার প্রমাণ এ সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা এবং তাতে বিন্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাধীনতা উত্তর দুই দশকে ...চেতনার ক্ষেত্রে জাতি একটা আলোচিত সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই যেন অগ্রসর মান। জাতীয় অস্তিত্বের ক্রন্দন ও রক্তপাতের সাথে রবীন্দ্রনাথের নিগুঢ় সম্পৃক্তির কারণেই সম্ভবতঃ তাঁর সৃষ্টিকর্ম নিয়ত প্রেরণার উৎস”।

 ১৯৮৫ সালের পর প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয়—

আবু জাফর - রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

ভুঁইয়া ইকবাল - রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান - রবীন্দ্র বাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য; রবীন্দ্র-রচনার

 রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা

মানসী দাশগুপ্ত - রবীন্দ্রনাথঃ এক অসমন্বিত দ্বন্দ্ব

আহমদ রফিক - রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও বাংলাদেশ

রশীদুল আলম - রবীন্দ্রকাব্যে ‘আমি’র ক্রমবিকাশ

আবদুল কাদির(সম্পাদিত) - নানা রবীন্দ্রনাথের মালা

আবুহেনা মোস্তফা কামাল সম্পাদিত)- রবীন্দ্রনাথ ...ইত্যাদি সম্পাদিত শেষোক্ত দুটি গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টিকর্মের বৈচিত্র্য ও বিশালতা প্রবন্ধগুলির শীর্ষনামে উদ্ভাসিত যেমন, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছায়াচ্ছন্ন ভালবাসা, রবীন্দ্রনাথঃ চিত্ররূপময় ভুবন; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ; রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা; রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি চিন্তা; সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা ও রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্য ইত্যাদি রচনায় প্রাবন্ধিকেরা আন্তরিকভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর সৃষ্টি কর্মের বৈচিত্র্য ও রহস্য অনুসন্ধান করেছেন তাঁদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথকে চেনা সহজতর হয়েছে।

 বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে সেখানকার পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বাংলা একাডেমী পত্রিকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পত্রিকা ‘সাহিত্য’ পত্রিকার ভূমিকা গৌরবময়। এছাড়া দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, মাসিক পূর্বাচল, নজরুল একাডেমী পত্রিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্র-ইতিহাস-ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি ও অন্যান্য সৃজনধর্মী রচনাদি বিষয়ে অজস্র মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে এইসব পত্র-পত্রিকায়।

 বিশ্বের দীর্ঘতম বইমেলা, বাংলাদেশের “অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১”-র মাসব্যাপী অনুষ্ঠানে, বাংলাভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবর্ষকে সামনে রেখে, বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদ্‌ অধ্যাপক অমর্ত সেন।

 ২১-কে নিজেদের পরিচিতি বলে মনে করছেন বাংলাদেশের বাঙালিরা, একুশের গ্রন্থমেলা মূলত উদার গ্রন্থ প্রেমী মানুষের মিলন মেলা, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

 পরিশেষে বাংলাদেশের দু-এক জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের মন্তব্য উদ্ধৃত করলে রবীন্দ্র-অনুরাগের চিত্রটি আরও স্পষ্ট হবে-

সন্‌জীদা খাতুন – ‘আমার রবীন্দ্রনাথ’ এ বলেছেন-

 রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে, সোনার বাংলাকে ভালোবাসার গান গাইতে গাইতে মিছিল করে চলার বেগে পায়ের তলার রাস্তা জেগে উঠল। ...এ পথে আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের চলার সাথি এবং সেই সঙ্গে পথের দিশারি। স্বাধীনতার আসল কথা যে পরাশ্রয় ছেড়ে আপন পায়ে দাঁড়ানো, রবীন্দ্রনাথের এ শিক্ষা আমাদের অবলম্বন ও সাধনার বিষয় হয়েছে।

বেলাল চৌধুরী- ‘আমার রবীন্দ্রনাথ’ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

 রবীন্দ্রনাথ আমার ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ আমার কর্ম। রবীন্দ্রনাথে আমি লালিত বর্ধিত। ...জীবনের সপক্ষে, স্বাধীনতার সপক্ষে, সভ্যতার সপক্ষে, শান্তি ন্যায় প্রগতির সপক্ষে, মানবতার সপক্ষে। আমাদের চিন্তা চেতনায় বোধবুদ্ধি মননে, প্রাণসত্তায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র বরাভয়, ধ্রুবতারা।

 তাঁর স্মৃতিধন্য বাংলার প্রতিটি ধূলিকণা আমাদের পরম তীর্থভূমি। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য , শাখা শিকড়ে আমূল প্রোথিত, আমাদের স্থায়ী ঠিকানা। অখন্ড গীতবিতানে নিত্য অবগাহণ আমাদের পুণ্যস্নাত করে।

মুস্তফা নূরউল ইসলা্মের ‘ আমার রবীন্দ্রনাথ’ এ আছে-

 পিতা দেবেন্দ্রনাথের দেওয়া দায়িত্ব পালনে রবীন্দ্রনাথ এলেন কুষ্টিয়ায়, পাবনায়, রাজশাহীতে। ১৮৯১-১৯০০ তাঁর পরিব্রাজন আর বসবাস বাংলার অন্তরভূমিতে আর রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা আবিষ্কার। আর তারপর বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার ঘটল প্রতিরোধের পথ ধরে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার উদ্বোধন ঘটিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান-হবে জয়, হবে জয় বাঁধ ভেঙে দাও, আমি ভয় করব না ভয় করব না, আমাদের যাত্রা হল শুরু, ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাধন টুটবে, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো – এইভাবে একাডেমিক, কেতাবি, নান্দনিক এলাকার বাইরে আর এক রবীন্দ্রনাথে উত্তরণ ঘটেছিল মুক্তিকামী মানুষদের।ক্রমে ১৯৬৮-৭০-৭১ এর নবীন প্রজন্মকে প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল সেই সব রবীন্দ্রনাথের গান আর তারপর “আমরা উত্তরিত হলাম সেই অভিযানের সেই সীমান্তে যেখানে সর্বজনের কণ্ঠে পবিত্র বিশ্বাসের উত্তরণ-“ ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমার কোলে জনম আমার মরণ। ...ওগো মা তোমার বুকে” এই মহত্তর অর্জনের বিশ্বাস। বাংলাদেশে রবীন্দ্র-আবিষ্কার সেই প্রান্তসীমায় প্রসারিত- “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি-”। স্বভূমিকে জানা, দেশপ্রেম, বাঙালিত্বে দীক্ষা দিলেন রবীন্দ্রনাথ- এই তিনে মিলে অনড় প্রত্যয় অর্জন- বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে জানল-জানছে-

গোলাম মুরশিদ ‘আমার রবীন্দ্রনাথ’-এ জানিয়েছেন-

 রবীন্দ্রনাথ... সমৃদ্ধ করেন আমার অস্তিত্বকে। ...আমার চিন্তা চেতনাকে জুড়ে থাকেন। ...আমাদের সুখ দুঃখের শরিক তিনি। সীমাহীন তাঁর সহানুভূতি। আমার মনের কথাটি তিনি ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন। আমার ধ্যানে জ্ঞানে তিনি বিরাজমান। তাঁর গানে আমি শুনতে পাই আমার আত্মার প্রতিধ্বনি। যে কথাটি আমি অনুভব করেছি, কিন্তু শত চেষ্টা করেও প্রকাশ করতে পারিনি কোনও ভাষা দিয়ে, সেই অনুভূতিকে বহু আগেই সুললিত ভাষার মালা দিয়ে সাজিয়ে রেখে গেছেন তিনি। ...গভীর শোকে সান্ত্বনা খুঁজে পাই তাঁরই কাব্য গানে। হতাশার অথৈ সমুদ্রে তিনি একলা চলার নিশিদিন ভরসা রাখার অনুপ্রেরণা জোগান। কান্নাহাসির দোলদোলানো জীবন পথের প্রতিটি বাঁকে তাঁর কথার ফলক জ্বলজ্বল করে শোভা পায়। তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে আমার বিশ্ব আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে।

 রবির আলোর মতই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সীমাবদ্ধতা নিয়েও একজন পরিপূর্ণ মানুষের আদর্শ। তাঁর আদর্শবাদ, ধর্ম, মানুষের মধ্যে বিভেদের দেওয়াল রচনা করে না। তাঁর ঈশ্বরও কোনও সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর নন, অর্মূত এক মহামানবের মতো। দেশপ্রেমিক হয়েও তিনি দেশের সীমানা দিয়ে চিহ্নিত নন। জাতিয়তাবাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি তাঁর উদার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না। দেশে দেশে তাঁর ঘর আছে। তিনি বাঙালি হয়েও বাঙালিত্ব নিয়ে বড়াই করেন না। ভারতবর্ষীয় হয়েও তিনি একজন আর্ন্তজাতিক মানুষ। তিনি একজন উদার মানুষ। “নাই নাই ভয় হবে হবে জয়” বলে অভয়ের বার্তা রেখে গেছেন তিনি আমাদের জন্য।

তথ্যসূত্র -

১। অমর একুশে : গ্রন্থমেলা স্মারকপত্র ২০১১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২। নন্দদুলাল বণিক, বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ে কিছু কথা (প্রবন্ধ পৃ ২৩০-

 ২৪১), আত্মচরিতের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

আজকের যুগে মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে দেখলে মনে বিস্ময় জাগে না। কিন্তু শতাব্দীকাল আগেও একটা সময় এমন ছিল যখন মেয়েরা ছিল গৃহবন্দি- শোষিত, অবহেলিত। প্রথমে পিতার শাসনে ও পরে স্বামীর শাসনে অন্তঃপুরেই জীবন অতিবাহিত হত তাদের। সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আজ মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে- এটাই সৌভাগ্যের। যদিও এর পেছনে পুরুষ সমাজের অবদান কম নয়; তবু বলা যায়, নিজেদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

 বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেও উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত কোনো মহিলা লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই শতকে এসেই প্রথম ছাপার অক্ষরে মেয়েদের লেখালেখি প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়। রাসসুন্দরী দেবী, কৃষ্ণকামিনী দাসী প্রমুখের হাত ধরে মেয়েরা প্রথম বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল, যা স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখ রচনাকারের হাতে এক নতুন দিশা পেয়ে আরও উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষপ্রধান বাংলা সাহিত্যে এঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি স্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

 উনিশ শতকের এইসব মহিলা সাহিত্যিকের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী অসাধারন ও অদ্বিতীয়। কোনও রকম সাহিত্য চর্চার পরিবেশ ছাড়াই কেবল মাত্র মনের তাগিদে তিনি যা লিখেগেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। মোট সাতটি কবিতার বই, ষোলটি গদ্য রচনা, একখানি ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য রচনা এবং একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে বাংলা সাহিত্যিক মহলে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। এছাড়াও রয়েছে সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় ছড়ানো- ছিটানো তাঁর বেশ কিছু অগ্রন্থিত রচনা।

 বাংলার নবজাগরণের এই পর্বে এসে মেয়েরা প্রথম আত্মপ্রকাশ পথ পেয়েছে ঠিকই, তবে কোথাও যেন একটা আড়াল, একটা সংকোচবোধ থেকেই গিয়েছিল। হয়ত তার কারণ ছিল কুলবধূর সম্মানহানির ভয় অথবা এমন হতে পারে- দীর্ঘকাল নিজেদের পর্দার আড়ালে রাখতে রাখতে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদটাই চলে গিয়েছিল তাদের মন থেকে। সেকারনেই তাদের লেখা ছাপার হরফে প্রকাশিত বা পাঠকমহলে সমাদৃত হলেও ছদ্মনাম ব্যবহার করাকেই তারা শ্রেয় বলে মনে করত। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর প্রথম দিকের রচনাতেও এই সংকোচবোধ দেখা যায়। স্বামীকে লিখিত তাঁর পত্রাবলি স্বামীর দেখাশোনাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, তবে তা তাঁর নিজের নামে নয়- ‘জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী’ নামে। এটি গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম রচনা। যদিও এ সময় পর্যন্ত স্বনামে মেয়েদের অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল, তবু মনে রাখতে হবে সেটা ছিল মেয়েদের আত্মপ্রকাশের প্রারম্ভিক কাল। লেখাপড়া শেখার জন্য পারিবারিক ও সামাজিক বহু বাধা-বিপদ পার করতে হতো মেয়েদের। বাল্যকালে বিবাহ, পর পর সন্তান প্রসব করা এবং অনেক ক্ষেত্রে অল্প বয়সে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করা ছিল তাদের নিয়তি। গিরীন্দ্রমোহিনীও এর ব্যতিক্রম নন। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। অল্প বয়সে সন্তানের জননীও হন তিনি এবং ছাব্বিশ বছর বয়সে বিধবা হন- এ যেন একেবারে ছকে ঢালা তৎকালীন বাঙালি নারীর জীবন। তবে গিরীন্দ্রমোহিনী ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম এই ছিল যে, বাল্যকালে বাড়িরই এক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া পিতার সংস্পর্শে ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ও ঘটেছিল তাঁর। সৌভাগ্য ক্রমে শ্বশুরবাড়ি ছিল সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র। স্বামী নরেশচন্দ্র দত্ত নিজেও ইংরেজিতে লেখালেখি করতেন। এই বাড়িতেই ছিল বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরি। স্ত্রীর পড়াশোনার বিষয়ে নরেশচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ থাকলেও বাড়ির কুলবধূ পড়াশোনা করুক তাতে অন্য পরিজনদের যে একেবারে আপত্তি ছিল না তা নয়। এ সম্পর্কে গিরীন্দ্রমোহিনী জানিয়েছেন, ‘রক্ষনশীল বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থাকিয়া বালিকা পত্নীকে শিক্ষা দানের চেষ্টা ফলপ্রূস হয় নাই।’ তবুও স্বামীর আগ্রহ ও প্রেরণাতেই গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে গদ্যে-পদ্যে লেখা তাঁর ‘জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী’ প্রকাশিত হয়। এর পাঁচটি পত্রের মধ্যে চারটি প্রবাসী স্বামীকে লেখা। নরেশচন্দ্র স্ত্রীর অজান্তেই এক বন্ধুর সহযোগীতায় পত্রগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। এই ব্যক্তিগত পত্র প্রকাশিত হওয়ায় গিরীন্দ্রমোহিনী লজ্জিত হয়েছিলেন এবং অভিমান করে স্বামীকে এক পত্রে লিখেছিলেন, ‘যদি আমার রচনা লোককে দেখাইতে এত ইচ্ছা হইয়াছিল, তবে বলিলে আমি অন্য কবিতা না হয় দিতাম। পত্র কেন প্রকাশ করিলে?’ এই অভিমানের পরিনাম স্বরূপ পরের বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর ‘কবিতা হার’ কাব্যগ্রন্থ। এই সময় কবির বয়স মাত্র পনেরো বছর। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’এ উচ্চশিত প্রশংসা করে লেখেন, ’শ্রুত আছি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকার প্রণিত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। পৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষ লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত। ইহার স্থান এমন যে তাহা কোন প্রকারেই অল্প বয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।’(জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ)

 ‘কবিতাহার’-এর কবিতাগুলিতে গিরীন্দ্রমোহিনী শিক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক বাঙালি নারীর দুর্দশার সজীব চিত্র এঁকেছেন। অবশ্য এজন্য তিনি শাশুড়ি, ননদিনী অর্থাৎ বাড়ির মহিলাদের ওপরই দোষারোপ করেছেন এবং পুরুষ সমাজের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন এই দুর্দিনে অশিক্ষিত নারীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য-

‘ওহে সাধুকুল সব হেন লয় মনে,

পাই যদি রীতিমত বিদ্যা মহাধনে।

হই যদি সকলেতে স্বাধীন আমরা

মনুষ্যের মধ্যে পণ্য হ’তে পারি মোরা

হে সাধুমন্ডলী! মোরা করি এ ভরসা,

 সত্বর করিবে পূর্ণ আমাদের আশা।’(বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা)

 এই একই ভাবনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় পরবর্তীকালে লেখা তাঁর ‘বিষম সমস্যা’ প্রবন্ধে। তবে সেখানে পরিস্থিতির সম্মুখে আত্মসমর্পণ নয়, অকাট্য যুক্তি দিয়ে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছেন, ‘নর ও নারী উভয়েই পৃথিবীর জীব, একে পিতা ওপরে মাতা, সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন উভয়েরই কর্ত্তব্যকর্ম্ম, পুরুষের যদি আত্মনির্ভরতা, স্বাধীনতার আবশ্যক হয়—আত্মোন্নতির জন্য প্রচুর জ্ঞানশিক্ষার, জীবনরক্ষার জন্য জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ব্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, তখন মেয়েদের উহাতে প্রয়োজন নাই কেন? তাহারা কি পৃথিবীর জীব নহে?’(ভারতী, শ্রাবণ ১৩০১ বঙ্গাব্দ)। নারী-স্বাধীনতা ও পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দাবি জানালেও এই প্রবন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনীর ভাষায় কোথাও ক্রোধ বা উত্তেজনা নেই।

 ‘কবিতাহার’-এর প্রায় ন’বছর পর প্রকাশিত হয় গিরীন্দ্রমোহিনীর ‘ভারতকুসুম’ কাব্যগ্রন্থ। এটিও ‘জনৈক হিন্দু মহিলা’ ছদ্মনামে। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছিলেন, ‘হিন্দুবালার কোন পুস্তক প্রণয়নে যে কত ব্যাঘাত, তাহা বোধহয় সকলেই জানেন।’ স্বামী-সংসারে স্বাধীন হলেও সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন যে যথেষ্টই ছিল, এই উক্তিতে তা স্পষ্ট। তাই মনের গোপনে যে মুক্তি বা স্বাধীনতার ইচ্ছাকে তিনি পোষণ করছিলেন তা সহজেই উঠে এসেছে ‘ভারতকুসুম’-এর কবিতায়-

‘ইচ্ছা হয় পাখী হয়ে গৃহ ত্যাজি যাই,

কৌমুদী হসিতাকাশে উড়িয়া বেড়াই!

 বাঁশির সুরেতে মিশি বিচরি নীল আকাশে।’(নিশীথ বংশধ্বনি)

 স্বামীর সংস্পর্শে গিরীন্দ্রমোহিনী যেটুকু শিক্ষা ও মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন নরেশচন্দ্রের মৃত্যুতে তাও হারাতে হল তাঁকে। অল্প বয়সেই বৈধ্যবের প্রচলিত সংস্কারের বন্ধনে বাঁধা পড়লেন তিনি। তাঁর এই অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা করেছেন তাঁর ‘মিলন’ সখী স্বর্ণকুমারী দেবী, ‘গিরীন্দ্রমোহিনী তখনো একরূপ অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকা, বিশেষ অল্পদিন তিনি বিধবা হইয়াছেন, স্বামীকে তিনি তাঁহার প্রাণের যে ইচ্ছা সহজেই জানাইতে পারিতেন; বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকটে তাহা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইলেন।’ (কবি গিরীন্দ্রমোহিনী : ভারতী, আশ্বিন, ১৩১১ বঙ্গাব্দ)

 এত বাধা সত্ত্বেও গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁর মনের আবেগকে প্রকাশ করার জন্য কাব্যকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন। স্বামীর শোকাশ্রুর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল ‘অশ্রুকণা’ (১৮৮৭ খ্রিঃ)। এবার আর নাম গোপন করে নয়- কবির স্বনামে অক্ষয়কুমার বড়ালের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। সার্থক নামকরণ এই গ্রন্থের, যার প্রতিটি কবিতা স্বামী-বিচ্ছেদের বেদনায় অশ্রুসিক্ত। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি প্রশ্ন করেছেন- ‘সংসার সুখের অভিলাষী, শোকাশ্রু কি কাহারো ভাল লাকিবে?’ কিন্তু অদ্ভুতভাবে এ কাব্য গ্রন্থ পাঠক মহলে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সমগ্র বাঙালী পাঠক যেন অন্তর থেকে এক বিধবার শোককে অনুভব করতে পেরেছিলেন-

‘যা ছিল আমার, দেহি’; মোর যা,- তোমারই সব!

 সবি পুরাতন, সখা, আছে অশ্রু- কণা নব!’ (উপহার)

 কোথাও অতিতের মধুময় স্মৃতিকে রমোন্থন করে শোকভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন কবি-

‘অতীতের রুদ্ধ দ্বার ভাঙি কি কুহক-বলে,

গত সুখ- রঙ গুলি

ধীরে ধীরে ল’য়ে তুলি

 টেনে যাও সেই রেখা- আঁধার হ্রদয় তরে!’ (স্বপ্ন)

 কোথাও বা সেই স্থানের সন্ধান করেছেন, যেখানে মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়তম রইয়েছেন-

‘সসীম ধরণী হ’তে বটে সে গিয়াছে চ’লে-

হেথা আর নাই!

অনন্তে রাজত্বে তব কোথা পুন পেলে স্থান

 জানিবারে চাই।’ (হেমা)

 সমাকালীন পত্রপত্রিকাতেও এই গ্রন্থ বহু প্রশংসিত হয়েছিল। The Calcutta Review পত্রিকায় লেখা হয়- ‘This is poetry in life and as the expression of that poetry Asrukana is the history of the soul of Noble Hindu Woman.’ (Oct., 1887).

 ‘অশ্রুকণা’র তিনবছর পর ১৫১টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হল গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘আভাষ’ (১৮৯০) কাব্যগ্রন্থ আভাষে কিছু কবিতা যে কবির ‘পূর্বাবস্থায় লিখিত’, তা কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় সেখানে দূঃখের ছায়া মাত্র নেই-

‘বৈরাগ্যের নামে, কভু নির্মমতা, এসো না নিকটে মোর।

ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিব, ছিঁড়িব মমতা-ডোর?’

নাম, যশ, মান- এসব কিছুই চান না কবি। শুধুচান-

‘কচি মুখে হাসি, বাসি সুধারাশি ফাঁসি হয় হোক তাই।

হয়ে জ্ঞানবান, মরুময় প্রাণ, কাজ নাই কাজ নাই।’ (নির্ম্মমতা)

যৌবনের সুখস্বপ্নে বিভোর কবি গেয়েছেন-

‘আঁকা বাঁকা গিরি-পথ উঁচু-নিচু আসমান,

চলেছে পথিক দুটি, গাহিয়া স্বপন- গান!

... ... ...

সম্মুখে ধূসর সন্ধ্যা, পিছলে জোছনা ভায়-

আকুল ব্যাকুল হৃদি উভয় উভয় চায়।’ (পথিক)

 কিন্তু কবির এই সুখ স্বপ্ন ভাঙার পরবর্তী অবস্থায় লিখিত কবিতাগুলিতে প্রিয় বিচ্ছেদের সুর সর্বত্র। প্রচন্ড বেদনায় মর্মাহত কবি লিখেছেন, ‘দুঃখ সাগরের কূলে ব’সে ব’সে ঢেউ গনি।’ যদিও এরপর প্রকাশিত গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যগ্রন্থ গুলিতে পূর্ববর্তী কাব্যের মতো বেদনার তীব্রতা নেই। তার বদলে জীবন সম্বন্ধে এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। ‘অর্ঘ্য’ (১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) ‘সিন্ধুগাথা’ (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি কাব্যে শোক রয়েছে, তবে তার উত্তালতা নেই। কবির শোকাশ্রু এখানে প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছে-

‘উন্মত্ত অধীর তাই প্রশান্ত সুনীল জল!

অমরে অমৃত দিলি, নীলকন্ঠে হলাহল;

 রন্তময়ী সুনীল গো! মানবে দিলি কি বল?’ (জলধীঃ সিন্ধুগাথা)

 গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সমগ্র রচনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এক ক্রমপরিবর্তন দেখা যায়। কাব্য রচনার প্রথম পর্বে নারী শিক্ষার, স্বাধীনতা ও যৌবনের যে আবেগ দেখা গেছে পরবর্তীকালে তা শোকাশ্রুর মধ্যদিয়ে এক দার্শনিক পর্যায়ে উন্নতি হয়েছে। গদ্য রচনার প্রথম পর্বেও তাঁর ভাষায় যে কোমলতা বা বিনয়ের সুর লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তীকালে তা কঠোর ও যুক্তিপূর্ণ হয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনা সম্পর্কে আরও একটি বিষয় স্বাভাবিকভাবেই মনে বিস্ময় জাগায় যে, সমকালের কোন পুরুষ বা নারী- সাহিত্যিকের প্রভাব তাঁর কোন গদ্য বা কাব্য রচনায় পড়েনি। তিনি সহজ-সরল ভাষায় নিজের গড়া ছন্দে নিজের মনের কথাকে সুরে গেঁথে গেছেন কোন অনুসরণ বা অনুকরন ছাড়াই। জীবনের সঙ্গে, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে বহু সংঘর্ষ করতে হয়েছিল তাঁকে। পরিবার ও সমাজের অন্ধসংস্কার ও পীড়নে বাংলার বুকে এমন বহু নারীর প্রতিভা প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই হয়ত ঝরে গিয়েছিল, কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁর অসাধারন ব্যক্তিত্বগুণে তাঁর ভিতরকার কবিসত্তাকে হারিয়ে যেতে দেননি। বরং দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে তারও বিকশিত হয়েছে।

হুমায়ুন আজাদের কবিতা : আবেগের সৃষ্টিশীল রূপ

মামুন রশীদ

সাংবাদিক, দৈনিক মানবকণ্ঠ

ঢাকা, বাংলাদেশ

হুমায়ুন আজাদ (জন্ম: ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ , মৃত্যু: ১১ আগস্ট ২০০৪)-এর পরিচয় প্রথাবিরোধী লেখক, বহুমাত্রিক লেখক হিসেবে। তবে যে অভিধাতেই তিনি চিহ্নিত হোন না কেন, তার বড় পরিচয় তিনি কবি। বিশ শতকের ষাটের দশকের কবিতার সচেতন শিল্পী। তার কবিতা আবেগের সৃষ্টিশীল রূপ। যেখানের আবেগের পরিশীলিত বোধ এবং শিল্পরূপ স্পষ্ট। তিনি নিজের কবিতা সম্পর্কে কাব্যসমগ্রের ভূমিকায় বলেছেন— ‘খ্যাতি, সমাজবদল এবং এমন আরো বহু মহত্ উদ্দেশ্যে কবিতা আমি লিখি নি ব’লেই মনে হয়; লিখেছি সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যে, আমার ভেতরের চোখ যে শোভা দেখে, তা আঁকার জন্যে; আমার মন যেভাবে কেঁপে ওঠে, সে কম্পন ধরে রাখার জন্য।’ সৌন্দর্যসৃষ্টি, শোভা মনের কম্পন তুলে ধরার জন্য হুমায়ুন আজাদ যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবন-অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে তার কবিতাকে সমর্পিত করলেন তা ষাটের দশকের কবিতার রুচি ও বৈদগ্ধ্যে সত্যিকার অর্থেই আলাদা ভাবে তাকে চিহ্নিত করে। হুমায়ুন আজাদ এবং তার কবিতাকে আলাদা করে দেয়। তিনি কবিতার বিষয়, আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তির চৈতন্যমুক্তির মধ্য দিয়ে হয়ে উঠলেন নাগরিক এবং একইসঙ্গে সময়াবর্তের এক স্পষ্ট বক্তা। ফলে তিনি আত্মকেন্দ্রিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ কল্পনার পাখায় ভর করে জীবনবোধের উজ্জ্বলতাকে আরো স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তার কবিতা কখনোই আত্মনিমগ্নতার স্থির অচল বৃত্তে বন্দি থাকে নি। ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই তিনি জীবনের অগ্রগতিকে অনুসন্ধান করেছেন।

সমকালীন পৃথিবীর পরিস্থিতিতে তিনি প্রতিবাদী। আবার জনজীবনের বৈচিত্র্যময় অনুভূতি প্রকাশের ফলে তার কবিতা সমকালে তো বটেই উত্তরকালেও বহুদূর বিস্তৃত। ষাটের দশকের কবিতায় রাজনীতি এবং সমকালের যে বিস্তর ও বাধাহীন চর্চা তার শৈল্পিক উত্কর্ষ ছড়িয়ে রয়েছে হুমায়ুন আজাদের কবিতায়। ঐতিহ্যকে এবং আধুনিক কালের প্রতিবাদী বিশ্বের সঙ্গে বুদ্ধি-হূদয় ও কল্পনা মিলিয়ে তার কবিতা হয়ে উঠেছে নাগরিক রুচির সর্বোত্তম প্রকাশ।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অলৌকিক ইস্টিমার’ প্রকাশ পায় ১৯৭৩ সালে। মানুষ, প্রকৃতি ও মাটির প্রতি যে শ্রদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তা দৃঢ় হয়েছে। নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের লাল-সবুজ পতাকার প্রতি তৈরি হয়েছে ভালোবাসা। মুক্তিযুদ্ধই আমাদের ভেতর তীব্র স্বদেশ চেতনার উন্মেষ ঘটায়। মুক্তিযুদ্ধই আমাদের করে তোলে গণসম্পৃক্ত। কিন্তু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুর্নগঠনে যে সময় পর্ব, তা স্বপ্নন্মুখ জাতির কাছে বড় বেশি ধীর মনে হয়েছে। ফলে খুব দ্রুতই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় বেদনার্ত হতে থাকে মানুষ। যদিও অস্তিত্ব সংকট তীব্র হয়ে ওঠেনি— তবু পরিবর্তন ঘনীভূত হয়ে উঠতে থাকে সেদিনগুলোতে—

বাঙলাদেশ বদলে যাচ্ছে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যেদিন

গদ্য লিখলো সেদিন থেকেই

ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু ক’রে দিচ্ছে মধুসূদনের জন্মসংবাদের রটনা

রবীন্দ্রনাথ ১০০,০০০ বার জন্ম নিলেন

বাঙলাদেশ বদলে যাচ্ছে

ঋতুবদলের সব চিহ্ন ঝুলে আছে

গাছে গাছে মেয়েদের ধাতব শরীরে

আমার পৌঢ়া মা ভোর না হতেই চলে যান টেলিফোন একচেঞ্জে

কনিষ্ঠা বোন সেই ভোরে লিপিস্টিক রুজ মেখে

বের হয় ফিরে আসে মধ্যরাতে, ফিরে আসে কিনা

তাও জানি না।

আজো বাঙলার যে-সব মেঠোপথ বাকি আছে

সেই সবে আরো পাঁচটা পাঁচশালা পরিকল্পনার পর

ট্রেন যাবে

 হুইসেল কাঁপিয়ে

কিষাণের ঘরে উঠে যাবে, উঠবে হোটেল

প্রতিদিন নতুন স্লিপ নিয়ে সেইখানে ঢুকবে কিষাণ,

পরষ্পরের প্রতি আমাদের আর কোন আবেদন নেই

মেয়েদের যৌনাবেদন ছাড়া আর কোন আবেদন নেই

তাহলে ফসল ফলবে কার জন্যে বলো?

(জীবনচরিতাংশ : ৪)

অভিজ্ঞতা এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় হুমায়ুন আজাদ স্পষ্টভাষী। তিনি একইসঙ্গে যেমন নেতিবাচকতার কথা বলেন তেমনি বলেন ইতিবাচক দিকের কথাও। ফলে তার কবিতায় আধুনিক অনুষঙ্গ খুঁজে পান পাঠক। নিজের ভেতরের যে কম্পন তিনি কবিতায় ধরে রাখার কথা বলেন— সেই কম্পন পাঠককেও অনুরণিত করে। তিনি দেশলাই জ্বেলে পাঠকের চেতনার ভেতরে আলো জ্বালিয়ে দেন। যে আলোয় ছড়িয়ে রয়েছে তীব্রতা, ঝাঁঝালো অথচ তাত্পর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি। হুমায়ুন আজাদ ষাটের দশকের কবিতার মূল সুরকে আত্মস্থ করেছেন— কিন্তু তিনি উচ্চকণ্ঠী নন। তার কবিতায় প্রতিবাদ রয়েছে, রয়েছে তীব্র ঘৃণা প্রকাশের সর্বোচ্চ প্রকাশ। তবু তার কবিতা কখনো হয়ে ওঠে নি উচ্চকণ্ঠের। হয়নি শ্লোগান। বরং বরাবরই তিনি সমকালকে ধারণ করে অনাগত এক রহস্যময়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভাষার সরোবরে তিনি তুলে ধরেছেন বোধের গভীরতম প্রকাশ। যার ফলে তিনি মানবমনের যেমন, তেমনি সমকাল ও ভাবীকালের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন—

বৃষ্টি নামে— গাছের পাতায়, জানালায় শাদা ভীরু কাচে।

ধবল হরিত্ বৃষ্টি, গ’লে যায় গাছ টাওয়ার পাখি ও পাথর।

বৃষ্টির মুখোমুখি রেশম লৌগ মাংস সব পাললিক।

বৃষ্টি নামে কালো চুলে, পাতাবাহারে, বনেটে, উইন্ডস্কিনে,

বৃষ্টি নামে সবচেয়ে সংগোপনে ফুটে থাকা নীল আলপিনে।

ঠোঁটে যেমন প্রত্যাশী তেমনি এই বৃক্ষ বাড়িঘর বাতিস্তম্ভ

হাসপাতাল যানবাহন সকলেই বৃষ্টির প্রত্যাশী;

বৃষ্টি নামলে বোবা বধির অন্ধ পাথর টের পায় তার বুকে কে এসেছে।

বৃষ্টিতে সবাই লজ্জাহীন, প্রধানমন্ত্রী থেকে কুলি ও কামীন সবাই বৃষ্টি চায়,

বৃষ্টি নামলেই পাথর সড়ক ট্রেন বিমান চালক ও আরোহী সবাই গ’লে

গাঢ় অভ্যন্তরে শাদা ধবধবে বৃষ্টির ফোটা হয়ে যায়।

আমার শরীর গলে সোঁদামাটি; টের পাই বুকের বা দিকে

 মাটি ঠেলে উদ্ভিদ উঠছে,

আমি তার সরল শেকড়।

(বৃষ্টি নামে)

হুমায়ুন আজাদের কবিতায় আকাঙ্ক্ষা আছে, কল্পনা আছে, আছে বাস্তবতা। তবে তিনি কখনোই উদ্ভট কল্পনার জগত্ তৈরি করেন না। বরং তিনি তার কবিতায় কল্পনার সঙ্গে আবেগ এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণে উন্মুক্ত করে দেন মনোঃসমীক্ষণের পথ। তার অনুভব ও চিন্তা উভয়ের সঙ্গেই রয়েছে আবেগের গভীর সম্পর্ক। তার কবিতায় আবেগ কাজ করে আত্মপ্রকাশের উদ্দীপক হিসেবে। তিনি মানবসম্পর্কের প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে, আমাদের ইচ্ছেশক্তিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে, আমাদের অবচেতন মন যা শনাক্ত করতে পারে না— সেই বিশেষ অবস্থাকে— অর্ন্তজগতের বহুরৈখিক বৈশিষ্ট্যকে আত্মপ্রকাশের বাহন করে তোলেন। সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রিত জীবন ও তার মনোবিশ্লেষন যে অভিনিবেশ দাবি করে— তা পুরোপুরি নিস্পৃহভাবে, যুক্তি, পারস্পর্যতার মধ্য দিয়ে তুলে আনেন হুমায়ুন আজাদ। মানুষের চেতন ও অবচেতনের গূঢ়তম ইচ্ছে, মৌলিক প্রবৃত্তি, চেতনের সঙ্গে অবচেতনের সম্পর্ক তার নির্মোহ অথচ ধারাবাহিক সন্ধান হয়ে ওঠে হুমায়ুন আজাদের কবিতা।

ক্রমশ সে বেড়ে উঠছে পার্কের গাঢ়তম গাছটির মতোন।

ডাল মেলছে চর্তুদিকে, যেনো তার সংখ্যাতীত ডাল উপডালে

ভ’রে দেবে সৌরলোক— জোনাকিরা জ্ব’লে যাবে

পাখি এসে বসবে ডালে, অখণ্ডিত নীলাকাশ

বাতাসে পা ভর দিয়ে আসবে যাবে সন্ধ্যায় সকালে।

শিকড় বাড়াচ্ছে নিচে, জল চাই তার

মালির পরিমিত জলে গাছ বাঁচে কখনো আবার!

 আগামী বৈশাখে

ষোলটি বসন্ত এসে দিকে দিকে ভ’রে দেবে তাকে

সে একা দোকানে যাবে কিনে আনবে লিপিস্টিক রুজ

মসৃণ দোপাট্টা ক্লিপ শ্যাম্পু জলপাই তেল

তিন বছর ধরে তাকে কিনতে হয় সেনিটারি মসৃণ টাওয়েল

দোকানে দোকানে ঘুরে চোখ থেকে লু’কিয়ে সবার

কিনে নেবে মাপমতো একখানি স্নিগ্ধ ব্রেসিয়ার।

...

আমার ষোড়শী কন্যা কার কণ্ঠস্বর?

কার অলৌকিক স্বরমালা র’টে যাচ্ছে সমস্ত প্রহর

তার মধ্যে? চুল তার গান গায়

নিবিড় শাওয়ার তলে পাঠাগারে শয্যাকক্ষে

সারাক্ষণ কে তাকে নাচায়। সে যে মানে না মানা

বাতাসে হারিয়ে আসে

স্থায়ী অস্থায়ী সবগুলো নিজস্ব ঠিকানা।

...

কাকে সে গ্রহণ করবে? কাকে দেবে নিজস্ব সৌরভ?

কার ঘরে সে আলো জ্বালবে দুর্ভেদ্য নিশীথে?

কার অসহ্য অভাবে

তার তরু পত্রপুষ্প মাটিতে হারাবে?

এদেশ বদলে যাচ্ছে, যা কিছু একান্ত এর

সবই নির্বিচারে নির্বাসিত হচ্ছে প্রতিদিন

ফ্রিজ ধরে রাখছে ঠাণ্ডা দিঘি সজীব শবজিক্ষেতের স্মৃতি

হোটেলে সবাই খাচ্ছে গৃহ আর কাউকে আনে না

স্নেহময় শর্করার লোভে

বাঙলার মেয়েরা আজ রান্না জানে না

রক্তনালি অন্য রক্তময়।

আমার কন্যা যার ফ্লাটে উঠবে, সে কি তার মন পাবে?

জয় ক’রে নেবে তাকে? নাকি রঙিন টেলিভিশন দেখার সুখ পাবে

ঝলমলে ড্রয়িংরুমে বসে? রেডিয়োগ্রামে

কড়া বাদ্য বাথরুমে জল

বন্ধুর বক্ষলগ্ন লিপিস্টিকে আলোকিত গোধূলিতে

বারবার বক্ষ থেকে খসে পড়বে সোনালি আঁচল।

আমার কন্যার ঘর ভেঙ্গে যাবে প্রাত্যহিক বাতাসে।

তবুও সে কাঁদবে না কেননা সে কাঁদতে শেখে নি,

হে আমার বন্ধ্যা কন্যা, অন্য কোন হাত

তোমাকে কি তুলে নেবে মধ্যরাতে ভাসমান উত্সবস্রোত থেকে

শেখাবে কান্নার অর্থ? বোঝাবে গভীর স্বরে

রোদনের চেয়ে সুখ নেই লবনাক্ত সবুজ মাটিতে?

বলবে মোমের আসা সর্বাত্মক গাঢ় অর্থময়

দ্বৈতশয্যা র’চে যাচ্ছে দুই হাতে সৌর সময়।

(আমার কন্যার জন্য প্রার্থনা)

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অলৌকিক ইস্টিমার’-এর প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৯৭৩। আর কবিতাগুলির উত্সর্গপত্রে লিখেছেন— ‘১৯৬৮-১৯৭২ রাত দিনগুলোর উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘ জ্বলো চিতাবাঘ’। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮০। এই পর্বের কবিতাগুলো ধারণা করি ১৯৭৩ পরবর্তী সময়ে লেখা। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া জাতি ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা। ঘুরে দাঁড়াতে শিখেছে। কিন্তু যে অশুভ চক্রের দ্বারা কলংকিত রক্তাক্ত অধ্যায়ের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হচ্ছে, তার জন্য প্রস্তুতি ছিল না। এতো বড় ক্ষতি মেনে নেবার সায় না থাকলেও, প্রতিবাদের ভাষা ছিল না। যে সাহস, যে শক্তি, যে ধৈর্য্য এবং দৃঢ়তা স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দিপীত করেছিল, সেই সাহস যেন মুহূর্তেই হারিয়ে গেল এক নিঃসীম অন্ধকারে। একের পর এক হত্যা, আর গণতন্ত্রের কবর রচিত হতে দেখলো মানুষ। টু শব্দটি যেন নেই। মানুষের এই চুপ করে যাওয়া, মানুষের এই থেমে যাওয়া, ভেতর থেকে তাগিদ না আসা, বিভ্রান্ত করেছে। ভুল ধারণা তৈরি করেছে। তাই যে স্বপ্ন নিয়ে হুমায়ূন আজাদ বলেন, ‘১৯৭১ যেমন ১৯৪৭-এর সংশোধন/ তেমনি ভুল যারা করেছে ভালোবাসায়/ সংশোধিত হবে সেই ভুল/এইবার; সংশোধিত হবে সংশোধিত হবে সংশোধিত হবে।/... অগ্নির বিকল্প ঘর; বাঙলাদেশে উঠুক শ্লোগান/ ১৯৭২ বাঙালাদেশে প্রেমর আর গৃহের বত্সর।’ (গৃহনির্মাণ)। সেই স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরি হয় নি। তাই তিনি বলেন—

এদেশ নিউজপ্রিন্টের মতো ক্রমশ ধূসর হয়ে যাবে

ময়লা হবে বৃক্ষ বক্ষ

ব্রা ভেদ ক’রে মাটি ছেদ ক’রে উঠবে নষ্ট পাথর

নদীতে নদীতে উঠবে দশ লাখ চর

মালির চোখের মধ্যে যেমন প’চে নষ্ট হয় সূর্যমুখি

দুর্গন্ধের কবলে পড়ে গোলাপ মল্লিকা

তেমনি আমার দুই চোখের ভেতর নষ্ট হবে শাদা পদ্মা

 জমিদের সবুজ সীমানা

সব গাঢ় সাংবাদিকের এখবর জানা

নোংরা চক্রান্তের মতো সাইক্লোন দুর্ভিক্ষ এই দেশে আসে

কেবল এগুলোই শত্রু নয় বাঙলার খেতখামার

 মেটারনিটি উড্ডীন আকাশে

পিতামহদের পাজামাপাঞ্জাবি ভ’রে প’চে গ’লে

 লেগে আছে নোংরা মূল্যাবোধ

আব্বার আস্তিনে শুধু শয়তানি

 তার ট্রাউজারের প্রতিটি বোতামা প্রতিক্রিয়াশীল

এখানে প্রতিটি যুবক দেখে পচা স্বপ্নাবলি

এখানে প্রতিটি মিছিলে হাঁটে নষ্ট বাতিল অতীত

এখানে প্রতিটি শ্লোগানে বাজে নষ্ট পচা সুর

এখানে প্রতিটি মঞ্চ থেকে বিলি হয় পচা ইশতেহার

এখানে নোংরা মূল্যবোধ ব্রা আঁটে পিন গাঁথে প্রতিটি যুবতী

রহিমা খাতুন, ৪০, তাই তিরিশ বত্সর ধরে

 এক খণ্ড বোবা পাথরের তলে চিত্ হয়ে আছে

আবদুলের হূিপণ্ড আঙরা হলো অগ্নিদাহে

বরফ আগুন চায় পাশ্ববর্তী বরফের কাছে

এদেশ নিউজপ্রিন্টের মতো বিবর্ণ ধূসর হয়ে যাবে।

(সব সাংবাদিক জানেন)

হুমায়ুন আজাদ সময়কে দেখেছেন, সময়ের ভেতরে বসে। তিনি দূরে নির্মোহ ভঙ্গিতে দেখে, তার বয়ান করেননি। বরং সময়ের ভেতরে বসে, সময়কে হাতে নিয়ে দেখার মধ্য দিয়ে তিনি প্রতি মুহূর্তে সময়ের পাল্টে যাওয়া উপলব্দি করেছেন। মানুষের ভেতরটা দেখতে পেয়েছেন। ফলে তার অনুভূতির সঙ্গে সময়ের পার্থক্য থাকেনি। ফলে তার কবিতা একদিকে যেমন সমকালের দর্পণ হয়ে উঠেছে, তেমনি তা একইসঙ্গে হয়ে উঠেছে দূরগামী।

বাঙলার মাটিতে কেমন রক্তপাত হচ্ছে প্রতিদিন

প্রতিটি পথিক কিছু রক্ত রেখে যায় ব্ল্যাডব্যাংকে: বাঙলার মাটিতে

জমা রাখে ভবিষ্যত্ ভেবে

প্রতিটি শ্রমিক তার চলার কুটিল পথে রাখে রক্তসূর্যবীজ

ইস্কুলের শিশুছাত্র যুবতীযুবক

গ্রামবাসী চাষী রিকশাঅলা নাড়াবাড়া কুত্তা ক্যানভাসর

জীর্ন মাঝি পদ্মার চিরকাল দণ্ডিত ধীবর

সবাই রক্ত রাখে ব্ল্যাডব্যাংকে: বাঙলার মাটিতে

বাঙলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখি

শুকোতে পারে পদ্মা উবে যেতে পারেও সাগর

বাঙলার নিসর্গমালা একদিন ধ’রে যেতে পারে

তবু এই রক্ত থেকে একদিন

পাবোই নতুন পদ্মা নিসর্গমালা উঠে-যাওয়া সেই গ্রামটারে

কে আর রক্ত রাখে ব্ল্যাডব্যাংকে হাসপাতালে

সেইখানে লালরক্ত ঘোলা হয়ে যায়

কাচশিশি অষুধের বিষাক্ত ছোঁয়ায়

বাঙলার মাটির মতো ব্ল্যাডব্যাংক আর নেই

 একবিন্দু লাল রক্ত

দশবিন্দু হয়ে যায় সেই ব্যাংকে রাখার সাথেই

তাই আর যায় না কেউ ব্ল্যাডব্যাংকে হাসপাতালে

বাঙলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখি।

(ব্ল্যাডব্যাংক)

প্রথম কাব্যগ্রন্থের পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের হুমায়ুন আজাদ নিজেকে পাল্টে ফেলেছেন। বণর্নায়, প্রকাশে, ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট হয়েছেন। নিজের ভেতরের যে অনুরণন তাকে পুড়িয়েছে, তাকে প্রকাশ করেছেন। সেই প্রকাশ সেই উপস্থাপনা স্বতঃস্ফূর্ত। জোর করে কোন ভাব যেমন তিনি কখনোই প্রকাশের চেষ্টা করেননি, তেমনি বলার ভঙ্গিমাতেও কখনো আড়ষ্ঠতার প্রশ্রয় ছিল না। বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যের আলোকরেণু তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন পাঠকের উদ্দেশ্যে। সেই সৌন্দর্য্য শুধু প্রশংসার না, সেখানে শুধু কাব্যের পেলবতা, মসৃণতা না বরং সূর্যের দৌদীপ্যমান তেজের অংশীদারিত্বও সেখানে। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সবই উঠে আসে তার কবিতায়।

তোমার নিতম্বে আপদমস্তক

নগ্ন খেলা করে একটা বন্দুক আর দুটো শিরস্ত্রাণ,

তোমকে গণ্ডরগর্ভ করার জন্যে পাখি-ডাকা-ভোরে

জেগে ওঠে একুশটা হিংস্র কামান।

রাইফেলের নির্দেশে তুমি ফোটাচ্ছো

সামরিক পদ্ম, সাইরেনে কেঁপে নামাচ্ছে

বর্ষণ, নাচছো বৃষ্টিতে চাবুকের শব্দে, এক ম্যাগজিন—

ভর্তি হলদে বুলেট পাছায় ঢুকলে তুমি জন্ম দাও নক্ষত্রস্তবকের

মতো কাঁপাকাঁপা একটা ধানের শীষ। প্রকাশ্য রাস্তায় তুমি একটা লজ্জিত রিকশা ও

দুটো চন্দনা পাখির সামনে একটা রাইফেল— একাজোড়া বুট— তিনটা শিরস্ত্রাণের সঙ্গে

সঙ্গম সারো;— এজন্যেই কি আমি অনেক শতাব্দী ধরে স্বপ্নবস্তুর

ভেতর দিয়ে ছুটে-ছুটে পাঁচশো দেয়াল-জ্যোত্স্না-রাত্রি-

ঝরাপাতা নিমেষে পেরিয়ে বলেছি, ‘রূপসী, তুমি,

আমাকে করো তোমার হাতের গোলাপ।’

(পরাবাস্তব বাঙলা)

হুমায়ুন আজাদ প্রেমিক। তবে সেই প্রেম নিবেদন বা প্রকাশ কখনোই নরম হাতের, আয়েশী ভঙ্গিমার নয়। প্রেম এবং বিদ্রোহের সঙ্গে আমাদের যে চিরন্তন সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে আরো বেশি স্পষ্ট আরো বেশি বর্ণনাত্মক করে তুলেছেন হুমায়ুন আজাদ। প্রকৃত প্রেমিকের মনোবেদনা ফুটে উঠেছে তার কবিতায়-

হুমায়ুন আজাদ, হতাশ ব্যর্থ শ্রান্ত অন্ধকারমুখি;

উত্ফুল্ল হয় না কিছুতে— প্রেমে, পুষ্পে, সঙ্গমেও সুখী

হয় না কখনো; আপন রক্তের গন্ধে অসুস্থ, তন্দ্রায়

ধ্বংসের চলচ্চিত্র দেখে, ঘ্রাণ শুঁকে সময় কাটায়

ওকে বাদ দেয়া হোক, নষ্ট বদমাশ হতাশাসংবাদী।

— এ-আঁধার উন্মাদ ও অন্ধরাই শুধু আশাবাদী।

(উন্মাদ ও অন্ধরা)

হুমায়ুন আজাদ প্রেমিক। সেই প্রেমে তিনি সবসময় নেতির মাঝে, বিপরীত চিত্রের মাঝে আশার আলো দেখেছেন। এই তার কবিতার মূল সুর। তিনি যদিও বলেন, ‘সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।’ যদিও বলেন—

আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের মতো থাকবে না তোমার,

যেমন হিরোশিমার পর আর কিছুই আগের মতো নেই

উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত।

যে-কলিংবেল বাজে নি তাকেই মুর্হুমূহু শুনবে বজ্রের মতো বেজে উঠবে

এবং থরথর ক’রে উঠবে দরোজাজানালা আর তোমার হূিপণ্ড।

পরমুহূর্তেই তোমার ঝনঝন ক’রে ওঠা এলোমেলো রক্ত

ঠাণ্ডা হ’য়ে যবে যেমন একাত্তরে দরোজায় বুটের অদ্ভুত শব্দে

নিথর স্তব্ধ হ’য়ে যেতো ঢাকা শহরের জনগণ।

(আমাকে ভালোবাসার পর)

তবু তিনি শেষাবধি প্রেমিকই। কারণ একমাত্র প্রেমিকই পারে ভালোবাসতে। প্রেমিকই পারে নিখাত ঘৃণা প্রকাশ করতে করতে। একমাত্র প্রেমিকই পারে অবহেলা করতে—

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক—

ঠিক করি শত্রু হবো মানুষের, হবো শয়তানের চেয়েও চক্রান্তকুশল।

গণতন্ত্রের শত্রু হবো, প্রগতি- সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে থাকবো চিরকাল।

প্রকাশ্যে করবো স্তব জনতার, গোপনে তাদের পিঠে

অতর্কিতে ঢোকাবো ছোরা; উল্লাসে হেসে উঠবো প্রগতির সমস্ত পতনে।

....

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক—

কিন্তু প্রত্যেক জন্মে আমার জন্যেই থাকে রুঢ় রাস্তা আর ফাঁসিকাঠ।

(যতোবার জন্ম নিই)

হুমায়ূন আজাদ নিজেকে ভালোবেসেছেন, শিল্পকে ভালোবেসেছেন। ফলে তার ভালোবাসার প্রকাশে যে তীব্রতা, যে আকুলতা, যে অকৃত্রিমতা তা চূড়ান্ত বিচারে প্রেম-ভালোবাসা। অনেকক্ষেত্রেই তিনি প্রথাবদ্ধ প্রেমের প্রকাশে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। আর এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। তার বলার মধ্যে, প্রেমের প্রকাশের মধ্যে যে দৃঢ়তা, বলার মধ্যে যে উচ্চস্বর, প্রকাশের মধ্যে যে অসংকোচ, যেখানে প্রচলিত প্রেমের রীতি নেই। যেখানে ভদ্রতার মুখোশ নেই, সেখানে সত্যিকার অর্থেই প্রকাশিত হয়েছে হুমায়ূন আজাদের পৌরুষ। যে প্রেম আনুগত্যহীন, যে প্রেম প্রায়শ্চিত্যহীন, যে প্রেম সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তুলে ধরে সময়ের উজ্জ্বলতা, তা তো জীবনের নতুন ব্যাখ্যাই বয়ে আনবে। কারণ তিনি জানেন

—

কী অদ্ভুত সময়ে সময়ে বাস করি

যা কিছু আমি ভালোবাসি তাদের কথাও বলতে পারি না।

বলতে গেলেই মনে হয় আমি যেনো চারপাশের

সমস্ত শোষণ, পীড়ন, অন্যায় ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে

সমর্থন করি।

(যা কিছু আমি ভালোবাসি)

হুমায়ুন আজাদ অন্ধকার, পিছিয়ে থাকা এবং নেতিবাচক দিকটি বোদলেয়ারের আধুনিকতায় সবসময়ে তুলে আনলেও তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন— ‘পৃথিবীতে আর একটিও বন্ধুক থাকবে না’। তিনি হতাশাবাদী না হলেও কখনো কখনো আবার তাকে মনে হয়েছে চরম হতাশাবাদী। তার এই দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনা প্রেমের প্রকাশেও—

তুমি তো যাচ্ছে চ’লে আমাকে কিছু দাও।

দাও বিষ করি পান, রক্ত ক’রে রেখে দিই রক্তনালীতে;

প্রত্যহ বইবো দেহে সে- দুর্লভ উপহারস্মৃতি।

...

তুমি তো যাচ্ছো চ’লে আমাকে কিছু দাও।

যদি পারো দাও জ্যোত্স্না ব্যালকনিতে,

জীবনের মাংসকোষে, কালের বিরুদ্ধে স্থির ধ্রুবতারা

ক’রে রাখি অমৃতা তোমাকে।

(তুমি তো যাচ্ছো চ’লে)

হুমায়ূন আজাদ স্বাপ্নিক। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সুস্থ পৃথিবীর। মানুষের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবেই বাসযোগ্য ভূমির। সমাজের অসংখ্য নেতিবাচক দিকগুলোকে খুচিয়ে খুচিয়ে তিনি রক্তাক্ত করেছেন। নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতি নিজের তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এই ঘৃণা এই রক্তাক্ত করার মধ্য দিয়েই তিনি সবুজ, সতেজ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন—

যখন পারমানবিক তেজস্ক্রিয়ার চেয়েও মারাত্মক এক তেজস্ক্রিয়ায়,

বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে আফ্রিকা

অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এশিয়া

 বিকৃত হয়ে যাচ্ছে আমেরিকা

 পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে ইউরোপ

তখনো মাফিয়ার সদস্যরা পারমানবিক তেজস্ক্রিয়ার দুঃস্বপ্নে উন্মাদ।

তিনি বলেন—

আমি ভূমিষ্ট হ’তে দেখেছি আফ্রিকার নেকড়ের চেয়েও

ভয়াবহ হিংস্র নেকড়ে। এই শেকড়েরাই চিরদিন পৃথিবী চালায়।

তারপরও তিনি আশাবাদী স্বপ্ন দেখেন—

কিন্তু না, পৃথিবীতে আর কোন নেকড়ে থাকবে না।

কিন্তু না, পৃথিবীতে আর একটিও বন্ধুক থাকবে না।

পৃথিবীতে আর কোন শিরস্ত্রাণ থাকবে না

পৃথিবীতে আর কোন বুট থাকবে না

পৃথিবীতে থোকায় থোকায় জলপাই থাকবে

কিন্তু কোন জলপাইরঙের পোশাক থাকবে না

আকাশভরা তারা থাকবে কিন্তু কারো বুকভরা তারা থাকবে না

পৃথিবীতে একটিও বন্ধুক থাকবে না।

(পৃথিবীতে একটিও বন্ধুক থাকবে না)

আমাদের কবিতায় তালিকাধর্মীতাকে বেশ পুরনোই বলা চলে। পঞ্চাশের দশকে কবি শামসুর রেহমান তার কবিতায় তালিকাধর্মীতার পুনপুন ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে। ষাটের দশকের কবিরাও তাদের কবিতায় এই তালিকাধর্মীতাকে বেশ সানন্দেই ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে হুমায়ুন আজাদও তার কবিতায় তালিকাধর্মীতার সফল প্রয়োগ করেছেন। তিনি কবিতায় যে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন, যে দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন, যে উপমা ব্যবহার করেছেন- তা একান্তই তার নিজস্ব। সময়ের ভেতর থেকে সময়কে দেখে তার প্রকাশে যে বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন হুমায়ূন আজাদ তা তার দশকে তো বটেই উত্তরকালের জন্যও ঈর্ষণীয়। বর্ণনা এবং প্রকাশে যে দক্ষতা, উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং কৌশল অবলম্বন করেছেন তা যে কোন সৃষ্টিশীল শিল্পীরই আরাধ্য। দুয়েকটি উদাহরণ দেই-

১) মূর্খ মানুষ, দূরে আছি, জানতে ইচ্ছে করে

দিনরাত লেফ-রাইট লেফ-রাইট করলে ক’মন শস্য ফলে

এক গণ্ডা জমিতে।

(তৃতীয় বিশ্বের একজন চাষীর প্রশ্ন)

২) আমার বাঙলাদেশে

 কোনো গ্রাম আর গাছ থাকবে না

কোনো কবি আর ডাকতে পারবে না নিসর্গের ডাকনাম ধরে

প্রেমিক প্রেমিকা কেউ পালিয়ে যাবে না পার্কে

নির্জন পুরানো কান্তারে

তাদের উদ্দাম গাড়ি থমকে দাঁড়াবে

 চাইনিজ রেস্তোরাঁর দ্বারে

নিসর্গকে হত্যা ক’রে বাঙলার উন্নয়ন হবে।

(বঙ্গউন্নয়ন ট্রাস্ট)

৩) মায়ের খোঁপার মতো একেকটি ঘর

(খোকনের সানগ্লাস)

৪) ওষ্ঠে পাতার সবুজ, ট্রাউজারে নীল, মধ্যমায় অস্ত-গলা সোনার আংটি

প’রে পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান জাহাজের মতো ঢেউ-ভরা ঘরে ঢুকে দেখি;

শাহানা শয্যায় গ’লে ক্রদ্ধ ক্ষুব্ধ ঘূর্ণি-জ্বলা ভয়ঙ্কর নদী হ’য়ে আছে।

(আধঘণ্টা বৃষ্টি)

৫) গরিবেরা সাধারণত সুন্দর হয় না।

শুধু যখন তারা রুখে ওঠে কেবল তখনি তাদের সুন্দর দেখায়।

(গরিবদের সৌন্দর্য)

৬) মানুষ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না; শুধু ভাবি

এতো কুৎসিত কী ক’রে হলো এই জন্তুগুলো? প্রত্যেকের মুখে

কী ক’রে জমলো এতো আবর্জনা? কী ক’রে সবাই এতো অস্বাভাবিক

হয়ে উঠলো? আজ তারা প্রত্যেকেই সংঘ, প্রত্যেকের চোখে

হিংসা, প্রত্যেকেই আগ্নোয়াস্ত্র; প্রত্যেকেই একেকটি তীব্র মতবাদ,

গ্রীবা চেপে উপভোগ করতে চায় জীবনের মনোরম স্বাদ।

(মানুষের সঙ্গ ছাড়া)

হুমায়ুন আজাদের কবিতায় অসামান্য চিত্রকল্পের সঙ্গে পরিশ্রুত বাংলা ভাষার মিলন ঘটেছে। ফলে তিনি দূরূহতম বিষয়কে প্রকাশ করেছেন সরল করে। তার কবিতার বর্ণনায় আবেগের যে অপরূপ প্রকাশ তাতে নেই ষাটের দশকের আবেগের আতিশয্য। তিনি সময়ের শ্রেষ্ঠ আবেগে তাড়িত হয়েছেন, উপলব্দি করেছেন, কামনা-বাসনায় তাড়িত হয়েছেন, সৌন্দর্যবোধে আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু এসরের প্রকাশে মুখর হয়ে ওঠেন নি। এসবের প্রকাশের জন্য বেছে নেন নি শ্লোগানাকে। কবিরা সত্যদর্শী। কবিরা দূরগামী। হুমায়ুন আজাদ- কবিতায় নিজের এবং সমকালকে যেন ঠিক ঠিক পড়ে নিতে পেরেছিলেন। তাই নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার মাঝে তিনি খুঁজে ফিরেছেন অকৃত্রিমতা। ছলাকলায় যেমন ভোলেন নি, তেমনি কানাগলির কুটিলতা, জটিলতার ধাঁধায় পড়ে কখনো পরিতৃপ্তি বোধ করেননি। ফলে নাগরিক মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মাঝেও তিনি নেতিবাচক দিক দেখেছেন। আবার সেখান থেকেই তুলে এনেছেন ইতিবাচকতার ইঙ্গিত। ফলে জীবনের ঐশ্বর্যভরা সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করেছে, আর এই আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ মন নিয়েই তিনি ভারী বুটের অসভ্য শব্দ যেমন চিনতে শিখেছেন, তেমনি মানবিক জীবনচর্চার ভেতর দিয়ে মুক্তির পাখা মেলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে কবি জীবনানন্দ দাশকে মনে করিয়ে দিয়েই বলতে পারেন—

যারা/ স্বপ্ন দেখে সুন্দরের পচে যাওয়া সমাজ-রাষ্ট্রকে যারা গোলাপের

মতো সুন্দর দেখতে চায়, যারা মনুষ্যত্বকে-মানবিকতাকে

ভোরের আলোর মতো সত্য ব’লে মানে, আপনি কি জানেন তারা

কোথাও নেই? আমরা তো উদ্বাস্তুর মতোই রয়েছি বাঙলায়

আপনি কি খুব জোর দিয়ে বলতে পারবেন যে আপনার

পায়ের নিচের মাটি খুবই শক্ত? শক্ত মাটি তো শুধু নষ্টদের

পদতলে।

...

বাঙলায় এখন নষ্টরাই অমর ও প্রাতঃস্মরণীয়। আপনাকে,

আমাকে সমকাল প্রত্যাখ্যান করেছে, ভবিষ্যত অবলীলায়

আমাদের প্রত্যাখ্যান ক’রে কোলাহল করবে নষ্টদের নিয়ে।

(শামসুর রাহমানকে দেখে ফিরে)

মাত্র সাতটি কাব্যগ্রন্থ ষাটের দশকের বহুমাত্রিক প্রতিভা হুমায়ুন আজাদের। কাব্যসমগ্রর ভূমিকায় বলেন— ‘অজস্র অসংখ্য কবিতা লেখার মনোরম দেশে আমি কবিতা লিখেছি কমই।’ বিশ শতকের ষাটের দশক বাংলা কবিতার জন্য একটি ফলবান সময়। এ সময়ের অধিকাংশ কবিই প্রচুর কবিতা লিখেছেন। প্রচুর ভালো কবিতা লিখেছেন। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের আগের দশকের এই কবিরা রাজনৈতিক যে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম নেবার অধ্যায়ের দিকে। সেই অভিজ্ঞতা, সেই রক্তাক্ত স্মৃতি, স্বজন হারানোর বেদনা আর শাসকের হাতে শোষিতের লাঞ্ছনার বেদনার ভেতর দিয়ে তারা পুষ্ট হয়েছেন। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের থেকে শাসনের যাতাকল থেকে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের যে মুক্তির লড়াই এই লড়াইয়ে ষাটের দশকের কবিদের অনেকের যেমন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে, তেমনি অনেকেরই রয়েছে পরোক্ষ অংশগ্রহণ। আবার আরো একটি বিষয় এ দশকের অনেক কবিই তার জন্মের পরে দেখেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তি। দেখেছেন উদ্বাস্তু মানুষের আর্তনাদ। ফলে এ দশকের কবিদের কবিতায় সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে মানুষ এবং মানুষের অর্ন্তজগত্। হুমায়ুন আজাদ তার কবিতায় মৃত্যুবোধ ও ব্যক্তিগত যন্ত্রণার যে আন্তরিক প্রকাশের মাধ্যমে সময়কে তুলে ধরেছেন তা বাংলা কবিতায় সহজলোভ্য নয়।

**শকুন্তলা : থীম পরম্পরা**

**ডঃ ঋতম্‌ মুখোপাধ্যায়**

**অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ**

**প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়**

সন্তানসম্ভবা একটি মেয়ে এসেছে পতিগৃহে, যদিও সে-বিবাহ সামাজিক নিয়মে নয় গান্ধর্ব মতে হয়েছিল। তবু তার ভরসা স্বামীর ভালোবাসা এবং বিশ্বাস। কিন্তু সর্বসমক্ষে রাজা সেই গোপন বিবাহ-কে স্বীকৃতি দিতে ভয় পেলেন, তাকে মিথ্যাবাদিনী বললেন। ক্রুদ্ধা, অপমানিতা মেয়েটি সুবিচারের অপেক্ষায় ফিরে গেলো অন্য কোনও অজানা আশ্রয়ে। যদিও শেষাবধি তাকে স্মরণে এসেছিল রাজার, তিনি ক্ষমাপ্রার্থীও হয়েছিলেন। ফিরে পেয়েছিলেন সব। কিন্তু এহেন ঘটনা সেকাল থেকে একাল একই ভাবে চলেছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় আমরা কি বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে সহবাস এবং প্রেমিকের সন্তান গর্ভে নিয়ে অসম্মানিতা মেয়েদের সুবিচারপ্রার্থী কিংবা আত্মঘাতিনী হতে দেখি না? সিঙ্গল মাদার কিংবা ডিভোর্সী মায়েদের আজও সমাজ কি সম্মানের চোখে দেখে? একটাই উত্তর না। বরং স্বামী পরিত্যক্তা স্বাধীনজীবী মেয়েদের আমরা এখনো সন্দেহের চোখে দেখি। মহাভারতের প্রতিবাদিনী শকুন্তলা কিংবা কালিদাসের নাটকের প্রতিবাদিনী হয়েও পতিব্রতা নায়িকাকে আমরা সাহিত্যে-সমাজে-শিল্পে বারবার ফিরে আসতে দেখি। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয় বিশ্বসাহিত্যেও শকুন্তলার ইমেজ অম্লান। পুরুষের মাধুকরীবৃত্তি আর নারীর অসম্মান-এর যে সামাজিক থীম তাকেই কবিতায়, নাটকে, চিত্রকলায় নানাভাবে পুনরাবৃত্ত হতে দেখি। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেছে উপস্থাপনের দৃষ্টিকোণ আর শকুন্তলা কাহিনির বয়ান দেশ-কাল-পাত্রভেদে নিত্য নতুন তাৎপর্য বিচ্ছুরিত করেছে।

 ।। ২ ।।

আমাদের ভারতীয় মানসে শকুন্তলা যেন একটা মিথ। মহাভারতের অন্তর্গত এই কাহিনি পৌরাণিক তাতে সন্দেহ নেই। প্রায় কিংবদন্তী হয়ে ওঠা এ-কাহিনির ভিত্তি কিন্তু ওই পুরুষ-নারীর প্রেম-বিবাহ-অবিশ্বস্ততার সামাজিক কাহিনি। সেদিক থেকে দেখলে রোলাঁ বার্ত তাঁর মিথতত্ত্বের যে ছকটি নির্মাণ করেন, সেটিকে শকুন্তলা প্রসঙ্গে অনায়াসে ব্যবহার করা চলে : শিকড় -> মিথ -> পুনর্নির্মাণ [Context > text > texture]। এই বিভিন্ন পুনর্নির্মাণের সূচনাবিন্দু অবশ্যই কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌’। সেখানে তিনি রাজার মাধুকরীবৃত্তিকে হংসপদিকার গানে তিরস্কার করলেও দুর্বাসার শাপ সংযোজন করে রাজা ও শকুন্তলা উভয়কেই বিচ্ছেদবেদনা ও মিলনসাধনায় দীক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি সেখানেও রয়ে গেছে একটি চরম সামাজিক সত্য এবং তা অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার চিহ্নবাহী। নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে আমরা দেখি, জনৈক বণিক ধনমিত্রের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু এবং তার সম্পত্তির রাজার অধীনে চলে আসার ঘটনা নিঃসন্তান রাজা দুষ্মন্ত-কে মর্মাহত করেছে। যদিও পরে পাওয়া গেছে সেই বণিকের এক গর্ভবতী পত্নীকে, সকলে আশ্বস্ত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, রাজবংশ নির্বংশ হয়ে যাবে অথচ তাঁর সন্তান বর্তমান এই যন্ত্রণা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থও রাজাকে শকুন্তলার প্রতি আরও বেশি ধাবিত করেছে। সপ্তম স্বর্গে মহর্ষি মারীচের তপোবনে সন্তান ভরতের মাধ্যমেই তিনি পৌঁছেছেন শকুন্তলার কাছে। রামায়ণে আমরা লব-কুশ-কে রাম-সীতার সংযোগসূত্র হিসেবে দেখি, যদি ভবভূতির মত ভেবেও নি মাতা-পিতার সম্পর্কের আনন্দগ্রন্থি পুত্র, তবুও একটা কিন্তু রয়ে যায়। শকুন্তলা রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম না দিয়ে রাজকন্যার জন্মও তো দিতে পারত, তাহলে? মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘দুর্ব্বাসার শাপ’ প্রবন্ধের প্রারম্ভিক উক্তিটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক মনে হয় যেন : ‘মহাভারতে রাজা দুষ্যন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না’। ‘দুর্বাসার শাপ’-কে সামনে এনে কালিদাসের শিল্পিত প্রলেপ এবং আত্মশুদ্ধির আদর্শ তার খুব একটা বদল ঘটাতে পারেনি।

 ।। ৩ ।।

বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনামূলক প্রবন্ধ ‘শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা’-য় যে ব্যাখ্যা আমরা পাই, তাকে ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। মিরন্দার সারল্য ও দেসদিমোনার পাতিব্রত্য শকুন্তলায় বঙ্কিম লক্ষ করেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ‘টেমপেস্ট’ নাটকের চেয়েও শকুন্তলা-কে উচ্চাসনে বসাতে চান। মহাকবি গ্যয়েটের শকুন্তলা-পাঠের প্রতিক্রিয়াকে এক্ষেত্রে তিনি অনুবাদ ও ব্যাখ্যাও করেছেন : ‘কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে’। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, মর্ত্যের তপোবনে প্রেমের অসংযম দুর্বাসার শাপে দগ্ধ হয়েছে। স্বর্গের তপোবনে গিয়ে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা দুঃখের মূল্যে যথার্থ দাম্পত্য প্রেমে দীক্ষা নিয়েছে। সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-এর ভারতীয় আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। এই আদর্শ শুধু সমালোচনায় নয়, সাহিত্যকর্মেও প্রতিফলিত। প্রসঙ্গত সমালোচক হরনাথ পাল এবং কবি অজিত দত্তের মূল্যায়ন মনে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের ‘শকুন্তলা’ শীর্ষক সমালোচনার ভাবাদর্শ শ্রী পাল রবীন্দ্র-উপন্যাস ‘চোখের বালি’-তে প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে দুষ্মন্তের অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে শকুন্তলা-লাভের গৌরবের আদর্শেই রচিত হয়েছে মহেন্দ্র-আশা সম্পর্কের অন্তিম পরিণতি। প্রথম যৌবনে প্রেমের অসংযম দুষ্মন্তের মতোই মহেন্দ্র-কে উচ্ছৃঙ্খল করেছিল, যে স্বভাব নানা পথ ঘুরে বিনোদিনীর কাছে আহত হয়ে শেষাবধি শমিত ও পরিণত হয়েছে। শ্রী হরনাথ পাল রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে ঈষৎ বদল করে লিখেছেন : ‘এই অনুতাপই মহেন্দ্রের তপস্যা, এই অনুতাপের ভিতর দিয়ে আশাকে লাভ না করিলে আশা লাভের কোনো গৌরব ছিল না’। অন্যদিকে কবি ও প্রাবন্ধিক অজিত দত্ত রবীন্দ্র-ছোটগল্পের নিজস্ব পাঠে অগ্রসর হয়ে ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে লক্ষ করেছেন শকুন্তলা-দুষ্মন্ত থীমের দূরান্বয়। মৃগয়াবিহারী নাগরিক রাজা দুষ্মন্ত ও বনবালা শকুন্তলার সঙ্গে শহরের পোস্টমাস্টার ও গ্রাম্যবালিকা রতনের অস্ফুট প্রেমের যে করুণ পরিণতি এবং সূক্ষ্ম বঞ্চনার ছায়া, তা অজিত দত্তের কাছে তুলনীয় মনে হয়েছে। তাঁর বক্তব্যটি অভিনব এবং উদ্ধারযোগ্য :

‘নাগরিক দুষ্যন্তের শকুন্তলার প্রতি আকর্ষণের মূলে ছিল তপোবন-পরিবেশ ও শকুন্তলার রূপ। রতনের প্রতি পোস্টমাস্টারের আকর্ষণের মূল সেরূপ পল্লীপ্রকৃতি-পরিবেশ ও নিজের নিঃসঙ্গতা। কোনোটিরই মূল অন্তরসঞ্জাত নয়, যোগাযোগ-নির্ভর; তাই কোনো আকর্ষণই স্থায়ী হল না। অপরপক্ষে শকুন্তলা ও রতন উভয়েরই অন্তরে প্রকৃতির অকৃত্রিম সরলতা, তাই তাদের ভালোবাসা অকৃত্রিম, গভীর ও স্থায়ী। শকুন্তলার আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েক বৎসর পরে (১৩০৯) কালিদাসের কাব্যের যে অন্তর্নিহিত ভাবটি কবি বিশ্লেষণ করেছিলেন, সে ভাবটি তার আগেই তিনি পোস্টমাস্টার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেইজন্য পোস্টমাস্টার গল্পটিকে শকুন্তলা কাব্যের কবিকৃত আধুনিক ভাষ্য বলে গণনা করা যায়’। (রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প)

এমনকি ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে লাবণ্যের জন্য আনা ‘এনগেজমেন্ট রিং’-এর সূত্রটিও বিদেশ থেকে নয়, শকুন্তলা-কাহিনি থেকেই পাওয়া। সুতরাং ‘থীম শকুন্তলা’ এভাবেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে বারংবার পুনর্নির্মিত হয়েছে।

 ।। ৪ ।।

বিশ্বসাহিত্যে শকুন্তলার সম্ভ্রান্ত পাঠক মহাকবি গ্যয়েটের কথা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর বিখ্যাত কাব্য ‘ফাউস্ট’-এর কাহিনির নায়িকা গ্রেটচেনের কল্পনাতেও কেউ কেউ শকুন্তলার ছায়া দেখেছেন। যে-নারী আমাদের ঊর্ধ্বায়ন ঘটায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদে পড়ি ‘চিরন্তনের মূর্ত প্রতিমা টেনে নিয়ে যায় আমাদের দেবযানে’ [The woman soul leadeth us upward and on.]। একথা কি আমরা বলতে পারি না, যে শকুন্তলাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুতাপে রাজাকে ক্রমশ মানুষ হিসেবে উন্নত করেছে এবং মর্ত্যের তপোবন ও স্বর্গের তপোবনের রবীন্দ্র-নির্দেশিত তুলনাসূত্রটি এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করি। আবার এই শকুন্তলা-পাঠে সন্দীপিত ফরাসি কবি আপলিনের একটি কবিতা লিখেছিলেন, যা উৎকলনযোগ্য মনে করি :

চারটি তারকা আকাশে ঘুরছে - ওরা

প্রতিরূপ ঠিক যেন অপরের একে

হরিণীর দুটি চোখের তুলনা আমার এ-চোখ জোড়া

ক্লান্ত এমন আমাকেই দেখে দেখে

দীপ্ত-মহিমা, উদ্যত ধনু হাতে,

রাজা আমাদের এখানে কখনো এলে পরে মৃগয়াতে,

দোহাই আমার হরিণীকে যেন না মারেন তিনি প্রাণে

তারই পাশে যেন আমায় বিদ্ধ করেন প্রণয়-বাণে… (পুষ্কর দাশগুপ্ত অনূদিত)

যদিও প্রতিনিধি-স্থানীয় নয় এবং পরবর্তীকালে আপলিনের এই কবিতাটিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন; তবু ভারতীয় শকুন্তলার কাহিনি ফরাসি-অনুবাদে পড়ে কবি ত্রস্তা হরিণী ও প্রেমের অসহায়তার চিত্রকল্পটিকে যথাযথভাবে চিনে নিতে পেরেছিলেন। কামুক পুরুষ ও অসহায়া নারীর প্রেমার্তির এই ছবি চিরকালের।

 ।। ৫ ।।

প্রবন্ধ, সমালোচনা এবং কাহিনির পুনর্বিন্যাস-কে বাদ দিলে, প্রত্যক্ষভাবে শকুন্তলা-দুষ্মন্ত কাহিনির পত্রকবিতা-রূপ দিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর ‘বীরাঙ্গনা’ (১৮৬২) কাব্যের প্রথম পত্রিকা ‘দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা’য় অসহায়া কিন্তু প্রতিবাদী শকুন্তলা-কে নতুনভাবে দেখি আমরা। নিয়তিকে মেনে নিয়েও শকুন্তলা দুষ্মন্তের মিথ্যাচারিতাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে। গ্রিক কবি ওভিদের ‘হেরোইদেস’ কাব্যের অনুসরণে রচিত এই পত্রকবিতাগুলিতে যন্ত্রণা আর মানবীচেতনা যুগলবেণী আমাদের নন্দিত করে। শকুন্তলা যখন পত্র শুরু করে এইভাবে,

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,

রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,

ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?

হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!

মধুকবির শকুন্তলা শোকাকুলা, বিরহাতুরা। তাই প্রকৃতির বর্ণনাতেও এসেছে নিরানন্দের ছোঁয়া। সংক্ষিপ্ত এই পত্রকবিতায় শকুন্তলার মনস্তত্ত্ব এবং তার সমকালীন সমাজচিত্রের আভাস পাওয়া যায়। তবু সবার উপরে বড় হয়ে উঠেছে নিবেদিতা প্রেমিকার ছবি। পতিনিন্দা তার কাছে গরলতুল্য। রাজবৈভবে তার লোভ নেই, সে চায় ভালোবাসার চেনা আশ্বাস। একদিকে সে বলে ‘কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে’ অন্যদিকে প্রেমিক-স্বামী ও রাজার প্রতি তার অভিযোগও জানাতে সে দ্বিধান্বিত হয় না। গান্ধর্ব বিবাহের পর আবার ফিরে আসার আশ্বাস দিয়েও ফিরে না–আসা রাজা দুষ্মন্তের প্রতি তার সেই অভিযোগ এইভাবে অভিব্যক্ত হয় :

এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,

কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,

নরাধিপ?

এই অভিযোগের পরেও শকুন্তলা বলে ‘জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!’। লক্ষণীয়, এখানে শকুন্তলার অঙ্গুরী-স্মারকের চিহ্নমাত্র নেই কিংবা তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার কথাও বলা হয়নি। মহাভারতীয় সেই আদিকাহিনি-কে নিজ ভাবনাদর্শ অনুযায়ী মধুসূদন সাজিয়ে নিয়েছেন। ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌’ নাটকের একাধিক বঙ্গানুবাদ [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ] ও অভিনয়ের নজির নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ঘাঁটলেই মেলে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে মৌলিক সাহিত্যকর্মের দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই।

 ।। ৬।।

রেফারেন্স হিসেবে বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-উপন্যাসে শকুন্তলার উল্লেখ মাঝে মাঝেই এসেছে। এবং রয়েছে বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় গদ্যরূপান্তর ‘শকুন্তলা’ এবং শিশুপাঠ্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্ররূপময় আখ্যান ‘শকুন্তলা’। তবে বিশ শতকে পঞ্চাশের কবি তরুণ সান্যালের ‘শকুন্তলা’ কবিতাটি গ্যয়েটের জার্মান প্রশস্তির অনুসৃজন হলেও সেটিকে আধুনিক বাংলা কবিতা হিসেবে পড়লেও চমৎকার লাগে :

তুমি বসন্তী ফুটে ওঠা কুঁড়ি

তুমি শরতের ফল

তুমি সে মাধুরী, তুমি আনন্দ

সরস শিল্পকলা

একটি বৃন্তে ধরেছ স্বর্গ মর্ত্যের সম্বল

জীবনে চেয়েছি যা-পেয়েছি তাই

তোমাতে শকুন্তলা।

গতকাল ছিলে বাদামি অলক প্রেমে স্রোতোধারা বয়ে

খাড়া উঠে গেছ সুনীল ঊর্ধ্বে দৈত্যের মতো হয়ে

আজ দেখি মাথা বরফে তুষারে রূপা ঝিকিমিকি করে

পোশাক থেকে তা ঝোড়ো রাত ঝরে ভ্রূরেখায় উড়ে পড়ে।

জানি যৌবন জরা দু’জনেরই কোনো রহস্য আছে

একই পিঠে বাঁধা, কেবল একটি ছোট স্বপ্ন মাঝে।

চাও কি তরুণ বছরের ফুল, ফুল ঝরে গেলে ফল

আত্মা ভরেছে সেই মাধুরীতে আনন্দে অবিরল?

আর যদি চাই স্বর্গ-মর্ত্য এক অভিধায় বলা

তাহলে সে তুমি, তোমার কথাই বলব শকুন্তলা। (এবং মুশায়েরা / গ্যয়েটে সংখ্যা / ২০০০)

প্রেম আর পূজাকে একাকার করে নেওয়া এই কবিতার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এরই পাশে নবনীতা দেবসেন-এর ‘অভিজ্ঞান’ শীর্ষক মৌলিক কবিতাটির আবেদন একেবারেই অন্যরকম। শকুন্তলার বেদনাদীর্ণ অথচ সংহত প্রতিবাদ মহিলা-কবির কলমে শিল্পিত রূপ পেয়েছে :

যদি বা মাছের পেটে চলে যায় অভিজ্ঞানটুকু –

অঙ্গুরীয়ে কি দরকার

স্পষ্টতই মনে আছে মুখ।

কেন চিন্তাকুল দৃষ্টি, ভ্রূধনু টঙ্কার

ললাটে কুঞ্চিত রেখাবলী?

মহারাজ! চিনেছো সকলি।

বৃথাবাক্য কেন ব্যয়, চলো শারদ্বত,

শার্ঙ্গরব, স্কন্ধে তোলো ক্লান্ত দণ্ডভার –

স্বপ্নাবৃত সমগ্র সংসার।

কখনো পড়লে মুখ মনে

হে প্রজাপালক,

চলে এসো চেনা তপোবনে

যেখানে সিংহের বুকে খেলা করে তোমার বালক।

লক্ষণীয়, শকুন্তলা এখানে ‘তোমার বালক’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করে রাজার উদ্দেশ্য-কে স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতেই এক অকালপ্রয়াত বণিক-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকার-এর প্রেক্ষিতে নিঃসন্তান রাজা দুষ্মন্তের বেদনা এবং পরে ভরত-কে দেখে তাঁর অনির্বচনীয় আনন্দ জেগে ওঠার কাহিনিসূত্র নির্দেশ করেছি। আবার ষাটের কবি রাণা চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাব্যের নাম দেখি : ‘শকুন্তলার মুখ’, যা তাঁর শয়নে, স্বপনে জেগে থাকে মনে। প্রেমাতুর হয়ে বলেন :

স্বপ্নে আমার অলীক প্রাসাদ মিথ্যে ভাঙা,

বিজন বনে হন্যে হয়ে মৃগয়াতে

তোমার জন্যে প্রতি রাতে হরিণ খুঁজি... (অগ্নি দিও শকুন্তলা)

সত্তরের কবি তরুণ মুখোপাধ্যায়ের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’তেও প্রেমের অনুষঙ্গে এসে পড়ে শকুন্তলা, মিরন্দার তুলনা,

তোমার শাড়ির অলঙ্কৃত পাড়ে ক্ষমাপ্রার্থী রোদ অই নতজানু –

যেন তুমি শকুন্তলা অথবা মিরন্দা নাম্নী বনচারিণীর মতো

আশ্চর্য করুণা আর ভালোবাসা দিয়ে মুছে দেবে পৃথিবীর যত পাপ;

একান্ত কাঙাল বালকের মতো তাই প্রত্যাশায় চেয়ে আছে সমূহ প্রকৃতি! (তুমি )

প্রকৃতি ও শকুন্তলার আশ্চর্য সম্পর্কের ছবি কবির মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে যায় আর আমাদেরও প্রেমিক করে।

 ।। ৭ ।।

শকুন্তলা কাহিনির গভীরে কালিদাসের পরিবেশ-প্রকৃতিচেতনা, সমাজবোধ এবং প্রাক্‌-বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ-কে অনুস্যূত করে দিতে পেরেছিলেন কালিদাস। প্রথম তিনটি অঙ্ক জুড়ে পূর্বরাগ, বিরহ এবং কামনার প্রহার শেষে গান্ধ্রর্ব বিবাহ ও মিলন-এর পর চতুর্থ অঙ্কটি সমধিক গুরুত্বময় বলে মনে করেছেন অধিকাংশ সমালোচক। যদিও নাট্যঘটনার জটিলতা ও কাহিনিবয়নে কালিদাসের সমধিক কৃতিত্ব পঞ্চম অঙ্কেই। তবু সেই বিখ্যাত শ্লোকটি আমরা সকলেই জানি : ‘কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা। / তত্রাপি চ চতুর্থো’ঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা’।। এই অঙ্কেই প্রকৃতির কবি কালিদাসের পরিচয় যেমন পাই, তেমনি পিতৃগৃহ ছেড়ে কন্যার স্বামীগৃহে যাওয়ার বেদনাবিধুর চিরকালীন ভারতীয় ছবি অসাধারণ নৈপুণ্যে আঁকা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম অঙ্কে এসে আমরা দুর্বাসার অভিশাপে বিবাহকথা বিস্মৃত রাজা যে ভাষায় এই অন্তঃসত্ত্বা বনবালাকে অসম্মান করেছেন, তা আজো নারীজাতির কাছে অপমানজনক ঠেকবে। তিনি শকুন্তলাকে ছলনাময়ী তো বটেই, মিথ্যাচারিণীও বলেছেন, কোকিলের উপমা দিয়ে শকুন্তলার সন্তানের পিতৃত্ব অবধিস্বীকার করতে চাননি [এবাদিভিরাত্মকার্যনির্বর্তিনীনামনৃতময়বাঙ্‌মধুভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ। ৫/২২]। নিজেকে তিনি সচ্চরিত্র বলেও দাবি জানিয়ে এবং তাঁর পরস্ত্রী গ্রহণের অনিচ্ছাও প্রকাশ করেছেন সর্বসমক্ষেই। অথচ সে যুগের রাজারা কি তেমন ছিলীন? পুরুবংশীয় রাজাদের ভর্ৎসনা করেই তো পঞ্চম অঙ্কের সুরু হয় হংসপদিকার গানে, যার ভাবানুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছেন এইভাবে : নবমধুলোভী ওগো মধুকর / চূতমঞ্জরী চুমি / কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ / কেমনে ভুলিলে তুমি’। এই প্রেক্ষিতে ‘বন্দীর বন্দনা’ কাব্যে বুদ্ধদেব বসুর ভাবনা এইভাবে কাব্যরূপ পেয়েছে :

 ঈষৎ আনতা কোনো তাপসকন্যার

রক্তিম স্তনাভা হেরি’ বল্কল-বসন-অন্তরালে

রাজার পছন্দ হ’লো। বিবাহের আছে শত পথ;

গান্ধর্ব প্রশস্ত অতি। বরমাল্য হ’তো বিনিময়,

বাসনার কৃতার্থতা। শতদার নারীমাংসলোভী,

কামুক রাজন্যকুল ছুঁয়ে-ছেনে বেড়াতেন ফিরি’

বিশ্বের সুতনুরাশি। কুমারীত্ব করিতে মোচন

পটুতার নাহি ছিল সীমা। নারীমেধ-যজ্ঞ-মাঝে

ইন্ধন হয়েছে শত শকুন্তলা। (কোনো বন্ধু-র প্রতি)

এই রাজকীয় সম্ভোগময় এবং যুদ্ধকীর্ণ প্রভুত্ব স্থাপনের জীবন কবির কাম্য নয়, তাঁরা কবিতাকেই প্রিয়া ভেবে এক উদার জীবন, ধ্যানের প্রসন্ন একাগ্রতায় পৃথিবীর নবজন্ম চান, বলেন ‘সে-পৃথিবী আমাদের’।

 ।। ৮ ।।

সম্পূর্ণ আধুনিক পটভূমিতে শকুন্তলা-কাহিনিকে আমাদের সামনে এনে উপস্থিত হতে দেখি পরশুরাম তথা রাজশেখর বসু, দীপক চন্দ্র-এর কথাসাহিত্যে। ‘ভরতের ঝুমঝুমি’ গল্পে রাজশেখর মহাঋষি দুর্বাসা-কে একালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ধূমপান ও ভোজনরত দেখান। তারপর মেনকার দেওয়া যে ঝুমঝুমি হারিয়ে ফেলে ও ফিরে পেয়ে শকুন্তলা-পুত্র ভরতের বংশধরকে দেওয়ার কথা তিনি বলেন এবং তাই নিয়ে শেষপর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক জটিলতা সামনে এসে পড়ে, তাতে গল্পের ছদ্মপৌরাণিক আবহে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপের কৌশল আমাদের চমৎকৃত করে। অন্যদিকে দীপক চন্দ্রের লেখা ‘আশ্রমকন্যা শকুন্তলা’(১৯৯০) আত্মকথনরীতি ও চেতনাপ্রবাহ-কে মিলিয়ে অভিনব উপস্থাপনা। সর্বদমন, শকুন্তলা এবং দুষ্মন্তের আত্মকথনে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন-কে তিনি দেখাতে চেয়েছেন। শকুন্তলার ভাবনায় তাই অনায়াসে এসে যায় রবীন্দ্রগানের পঙ্‌ক্তি। স্বল্পদিনের দাম্পত্যজীবনে যৌনস্মৃতিও শকুন্তলার মনে কার্যকর, তাও দেখান লেখক। এছাড়া সর্বদমন তথা ভরতের চোখ দিয়ে মায়ের অবমাননা এবং রাজপুত্র হয়েও আশ্রমিক জীবনের বিড়ম্বনা এখানে স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি আশ্রমকন্যা এই পরিচয় এবং নারীত্বের আত্মসম্মানবোধই শকুন্তলা-কে আধুনিকা করেছে, রাজমহিষী বা রাজমাতা হওয়ার লোভ তার নেই। দুষ্মন্তের বিবেক জাগরণ এবং শকুন্তলার ফেরা বআ না-ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে দোলাচল-কে চিত্রিত করেছেন লেখক। মনস্তাত্ত্বিক আলোকে পুনর্নির্মিত এই আখ্যানে আংটি প্রসঙ্গ এবং অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এখানে গৌণ ভূমিকা পালন করেছে। এর বাইরেও রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘শকুন্তলা’ (১৯৮৪), অমিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণা সেন, রমেন ভট্টাচার্য প্রমুখের বিশ শতকের শেষ দুই দশকে রচিত একাধিক পুনর্লিখিত আখ্যানমালা । রচিত হয়েছে নানাবিধ নতুন ভাবনার প্রবন্ধাবলী ও অনুবাদ ।

 ।। ৯ ।।

আমরা শুরুতেই যে মিথিক্যাল বলয় ক্রমশ তৈরি হয়েছে শকুন্তলা-কে ঘিরে তার উল্লেখ করেছিলাম, তারই নিরিখে আলোচনা-শেষে দেখতে পাই, পুরাণের ভিতর যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের দূরত্ব পূরণ করে নেওয়ার ইঙ্গিত আছে শকুন্তলা কাহিনি তার ব্যতিক্রম নয়। অলৌকিকতা, লোকবিশ্বাস এবং সমাজবোধ সঞ্জাত অসংযত প্রেম, যৌনতা, পতিগৃহে কন্যার আচরণীয় বিধি, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই বিশ্বাস এবং দাম্পত্যে প্রেম-এর চেয়েও মানিয়ে চলার গুরুত্ব বেশি ইত্যাদি চিরকালীন ভাবনাগুলি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। পুরুষের বহুগামিতা মিথ-টিই কেবল নয়, নারী-পুরুষ ও সন্তানের আনন্দময় গ্রন্থিও যে ভারতীয় সংসার জীবনের প্রধান অবলম্বন, তা আরেকবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় শকুন্তলা-দুষ্যন্ত-ভরতের কাহিনি। খ্রিস্টপূর্ব যুগের কালিদাস থেকে বিশ শতকের সৃজনশীল সাহিত্যে শকুন্তলার এই প্রভাব ও প্রেরণা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই আধুনিক গানেও শুনতে পাই ‘তোমার দেওয়া অঙ্গুরীয় খুলতে পারিনি’ কিংবা ‘জলে হারিয়েছে কান সোনা কি’?

**ঋণস্বীকার-**

১) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌। সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সং

২) বাঙালির শকুন্তলা চর্চা । তরুণ মুখোপাধ্যায় সং

৩) শিলীন্ধ্র । মহাকবি কালিদাস সংখ্যা । ১৪১১

৪) মিথ পুরাণের ভাঙা-গড়া । চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

৫) পুরাণদর্পণে দীপক । দে’জ

৬) দোতারা : মিথ সংখ্যা ২০১৩

৭) আপলিনের কবিতা / পুষ্কর দাশগুপ্ত অনূদিত

৮) তরুণ সান্যাল : কবি একা জাগে । তরুণ মুখোপাধ্যায়

এছাড়া বিভিন্ন কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নির্বাচিত কবিতা, কাব্যসংগ্রহ এবং ইন্টারনেট-এর সাহায্য নিয়েছি।

শুধু ‘সহোদরার’র জন্যই যে কবিতাটি

ড. আকাশ বিশ্বাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ

না,সে নয়। অন্য কেউ এসেছিল । ঘুমো,তুই ঘুমো ।

এখনো রয়েছে রাত্রি, রোদ্দুরের চুমো

লাগেনি শিশিরে । ওরে বোকা,

আকাশে ফোটেনি আলো, দরজায় এখনো তার টোকা

পড়েনি। টগর-বেলা-গন্ধরাজ-জুঁই

সবাই ঘুমিয়ে আছে,তুই

জাগিসনে আর। তোর বরণডালার মালাগাছি

দে আমাকে,আমি জেগে আছি।

কবিতার নাম ‘সহোদরা’। কবির নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ।যাঁর সম্পর্কে সমালোচক বোলে থাকেন : “ সহজ কথকতার ঢঙে গভীরতম উপলব্ধিকে এভাবে দক্ষতার সঙ্গে ছড়িয়ে দেবার মুন্সিয়ানায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অদ্বিতীয়। ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝবেন,এই সহজতা আয়ত্ত করা কী কঠিন কাজ।’’[ কবিতা নিয়ে :হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ] আর এ যাত্রায় ভুক্তভোগী হয়ে আমরাও টের পাচ্ছি কত কঠিন;অতি সহজ করে বলা তাঁর কিছু কবিতার মনের কথা বুঝতে পরা!ঠিক যেমন এই কবিতাটি।

এমনিতে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে কত কিছুই তো জানি আমরা!১৯২৪ -এর ১৯ শে সেপ্টেম্বর;অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে জেলার চান্দ্রা গ্রামে জন্মানো নীরেন্দ্র্রনাথ ছিলেন পিতামহ লোকনাথ চক্রবর্তী’র প্রথম সন্তান জিতেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর মায়ের নাম ছিল প্রফুল্লনলিণী এবং জন্মসূত্রে বয়সে বড়ো ও ছোটো দু’দু’জন সহোদরার সহোদর ছিলেন তিনি। কিন্তু এ সব মামুলি তথ্যে কতটুকু বুঝতে সুবিধা হয় কবিতাটি ?আবার ইতোপূর্বে সহোদরা নিয়ে আর কিছুই আমরা পড়িনি বাংলা কবিতায় –তাও তো নয়। আপাতত আর কোনো উদাহরণ মনে না এলেও—কাজলা দিদির নামটা নিদেনপক্ষে আসাটা অবশ্যম্ভাবী। অথচ কোনো সূত্রই এক্ষেত্রে আমাদের সবিশেষ সাহায্য করতে পারে কোথায়?

পড়তে শুরু করে এইটুকুই শুধু বুঝতে পারি আমরা—কেউ একজন কথা বলছে । এবং সেটা স্বগতোক্তি নয় কোনোভাবেই । কথা বলছে কোনো একজনের উদ্দেশ্যে। বুঝিয়ে-বুঝিয়ে কথা বলছে সে। উপদেশ বা স্তোকবাক্যের মতো অনেকটা । যার মধ্যে প্রবঞ্চনা থাকতে পারে ,নাও পারে! হলফ্ করে কিছু বলার স্বাধীনতা নেই। এবং কথক-ব্যক্তিটির এই সমগ্র প্রচেষ্টাটি যে কার্য-কারণ সম্পর্করহিত ;এমনটাও ভেবে নেওয়ার সুযোগ নেই কোনো। স্থিতধী অভিভাবকের কন্ঠে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে কেউ একজন। এখনই জাগতে বারণ করছে কাউকে। যেন প্রতীক্ষারত কেউ হঠাৎ ,অসময়ে উতলা রজনীর কোনো চঞ্চল প্রহরে জেগে উঠছে ,হয়তো সে সম্পর্কে এই কবিতা লেখকের সহোদরা ;অথচ জেগেছে যার উৎকন্ঠায়—তার আসার সময়ই হয়তো হয়নি এখনো! প্রতীক্ষার প্রহর আসতেও তো কিছু অবকাশ লাগে! ধৈর্য ধরে অপেক্ষাও তো শিখতে লাগে—উপোযুক্ত সময়ের জন্যে । যেমন করে নিদ্রামগ্ন পুরবাসী অপেক্ষা করে থাকে আলো ফোটার । আলো ফোটে। জলে-স্থলে-বনতলে দোলা লাগে । তখন দ্বার খুলে বাইরে আসে সে। ততক্ষণে তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে—নতুন একটা দিন শুরুর,নতুন করে জীবনের পথ চলার।

কিন্তু সময়ের অনেকটা আগে যদি অকস্মাৎ জেগে ওঠে কোনো নাবালোক অনুজ ? অধৈর্য্য অ্যাডোলেসেনস্ -এর কোনো উচাটন মুহূর্তে যদি সে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে উৎসুক হয়ে ওঠে,কী করবে তখন তার অভিভাবকেরা ? কোন ভাষায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রস্ত করবে তাকে ?সম্ভবত সেই শিক্ষার একটি অসাধারণ টেক্সট্ হতে পারে নীরেন্দ্রনাথের এই কবিতা।

এই কবিতায় কথা বলেছেন যে কথক ,অর্থাৎ যিনি অসময়ে জেগে উঠতে মানা করছেন তার সহোদরাকে, তিনি সম্পর্কে দাদা বা দিদি; যা খুশি হতে পারেন—তাতে অসুবিধে নেই। কিন্তু অসুবিধে ; যদি আমরা এই কবিতার অনুষঙ্গে বড়ো গলা করে বলতে যাই : ‘‘তিনি প্রেমকে যতোটা মর্যাদা দিয়েছেন,শারীরিকতাকে তার কানাকড়িও দেননি। ’’[ঐ] প্রশ্ন উঠতে পারে ,এ’ কবিতায় যৌনতা কোথায়? এ তো নেহাতই শিশুভোলানো, ঘুম-পাড়ানিয়া কবিতা। অসময়ে ঘুম ভেঙে উঠে পড়া সহোদরাকে যেন এ’কথা–সে’কথায় আবার ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে দাদা বা দিদি গোছের বয়সে বড়ো কেউ! হতে পারে । এহেন নিতান্ত সহজ স্বাভাবিকতায় এ’কবিতাকে গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু আমরা যে আগেই জেনেছি সমালোচকের কাছ থেকে , নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহজতাকে আয়ত্ত করা বড়ো সহজ সওয়াল নয় ! আমরা যে আগেই বক্তাকে (সম্পর্কে দাদা বা দিদি গোছের কেউ) তার সহোদরাকে বলতে শুনেছি:

 ... ... ... ... ... তোর বরণডালার মালাগাছি

 দে আমাকে,আমি জেগে আছি।

ঘটনাচক্রে মনে পরছে ছোটোবেলায় যখন প্রথম পড়েছিলাম একটা বিখ্যাত বই; *‘ভোলগা থেকে* *গঙ্গা*’;তার একেবারে প্রথমদিকে,মানবসভ্যতা বিকাশের ঊষালগ্নের অব্যবহিত পরের ইতিহাস যখন লিখছেন,রাহুল সাংকৃত্যায়ন, যখন সদ্য বর্বর যুগ পেরিয়ে আসা দুই মানব-মানবীর প্রেম-যাপনের অনবদ্য এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন,যেখানে তিনি ভোলগাতীরস্থ দিবা আর সূরের কথা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

‘‘তা’হলে ছেলেবেলার সেই দিবা-সূর হয়ে উঠব আমরা আবার। ’’

ছোট শিশুর মতো নগ্ন মনোরম মূর্তি পরিপূর্নভাবে পরস্পরের অধরে অধর মিলিয়ে দিল।

আর দিবা ,সূরের তিসি ফুলের মতো নীল চোখ দুটোর ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চুমু খেতে

খেতে বলল, “তুমি আমার আপন মায়ের ছেলে – আর আমি তোমাকেই ভুলেছিলাম।’’

পড়ে আগুনের ছেঁকা লেগেছিল হাতে। তখনও মর্গনের *‘অ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি’* বা এঙ্গেলসের *‘পরিবার,ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি’* দূরে থাক ‘অজাচার’ শব্দটাও জানা-বোঝার বাইরে। অথচ আজ যাকে ‘অজাচার ’ নাম দিয়ে একান্ত গর্হিত ও ঘৃণ্য ভাবছি আমরা ,সভ্যতার ঊষালগ্নে ব্যাপারটা তো ছিল রীতিমতো উল্টোই। একসময় তো রক্তের সম্পর্ক থাকা মানুষদের মধ্যে যৌন সম্পর্ককেই পবিত্র ধরা হত। আদিমকালে যখন গোত্রের বাইরে এমনকি পরিবারের বাইরেই বিয়ে চালু হয়নি,ভাই-বোনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতিই ছিল সর্বাপেক্ষা কাক্ষিত । সেই সংস্কৃতির প্রভাব যেমন গ্রীক মিথোলজি থেকে হিন্দু পুরাণ,উপনিষদে ছড়িয়ে আছে ভুরি-ভুরি,তেমনই আজও বিচ্ছিন্ন কিছু পকেটে ছোটো-ছোটো নানান জনগোষ্টীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে অতিনিকট সম্পর্কে বিবাহের অবাধ রীতি। একসময় ফ্রয়েড সাহেবও ‘ইনসেক্ট’-এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন ,যৌন এষণা উন্মীলিত হওয়ার সময় ঘন রক্ত-সম্পর্কের দিকেই নাকি ধেয়ে যায় আকাক্ষা ! যদিও তাঁর এই কথা নিয়ে বিতর্ক আছে প্রভূত এবং সে সব কথায় আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই , কিন্তু ইতোপূর্বে সমালোচকের সেই কথাটি অর্থাৎ : ‘‘তিনি প্রেমকে যতোটা মর্যাদা দিয়েছেন ,শারীরিকতাকে তার কানাকড়ি দেননি’’; এই বক্তব্যের ‘কানাকড়ি’ শব্দটিকে নিয়ে একটি ‘অকারণ’ বিতর্ক পাকিয়ে তোলার চেষ্টা করব না,তা কী করে হয়! কেননা হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ধার করেই আমরা নিজেদের একটি বিশ্বাসের কথা সহজেই জানাতে পারি যে, ‘‘অহেতুক যৌন পরাক্রম সাধারণত নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় দূরেই থেকেছে। এটা রুচির প্রশ্ন,সম্ভবত প্রবণতার প্রশ্ন। কোনও মানবিক আবেগের কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি তাঁর কবিতায় সাধারণত পাওয়া যাবে না।’’[ঐ]

কিন্তু সহজ করে কবিতা লেখার সহজাত প্রতিভা ,আগাগোড়া অর্জিত যে নীরেন্দ্রনাথের ,যাঁর কবিতায় অতিসহজে অনেক বড়ো কথা বলে দেওয়াটা রেওয়াজ—অনেকসময় তা কিন্তু সহজতার ছলে নজর এড়িয়ে যেতেও অতিসক্রিয় । নিঃসন্দেহে এ কবিতাতেও যৌনতা কখনোই জমকালো কোনো পরিসর জুড়ে বসেনি। নীরেন্দ্রনাথের কোনো কবিতাতেই তা হয় না। কিন্তু কে জানে, এই কবিতায় শিশু বা কিশোর মনস্তত্বের এক অতিগোপন কোনো গুহার সামনে তিনি পাঠককে অজান্তেই দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছেন কি না ? আবার এভাবেও তো ভাবা সম্ভব যে , বরণডালা নিয়ে সময়ের আগেই যদি সয়ম্বরে যেতে আকুল হয়ে ওঠে আমাদেরই কারো সহোদরা ,তখন সেই নাবালিকার অকুতোভয় অসময়ী আকাঙ্ক্ষাকে কত না অন্যায় ঊপায়েই অবদমন করতে হয় অভিভাবক কুলকে! কত শারীরিক নির্যাতন ,কত বন্ধ ঘরের দরজার আড়ালে গুমরে ওঠা কান্না …; কই আমরা তো পারি না নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী’র মতো এমন কোমলতায় কথা বলতে। আমরা তো বলতে পারি না :

 না রে মেয়ে, না রে বোকা মেয়ে,

আমি ঘুমোবো না। আমি নির্জন পথের দিকে চেয়ে

এমন জেগেছি কত রাত,

এমন অনেক ব্যথা-আকাঙ্ক্ষার দাঁত

ছিঁড়েছে আমাকে। তুই ঘুমো দেখি,শান্ত হ’য়ে ঘুমো ।

শিশিরে লাগেনি তার চুমো,

বাতাসে ওঠেনি তার গান।

 ওরে বোকা,

এখনও রয়েছে রাত্রি ,দরজার পড়েনি তার টোকা।

অথচ আমরা তো পারি না দিতে,সহোদরার হয়ে একটাও রাত্রি জাগার প্রতিশ্রুতি।আমরা বোধহয় স্বীকারও করতে পারি না এমন করে সত্যি কথা! কিন্তু যে বয়েসে ,প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রাপ্তমনস্কতা আসার অনেক আগের অপরিণত বয়েসে এমন যে ব্যথা-আকাঙ্ক্ষার দাঁত কামড়ে- খুবলে অস্থির জাগিয়ে রাখছে এই কবিতার কথককে , তার সহোদরাকে, তেমন রাত কি আমাদের জীবনেও নিতান্ত কম এসেছে বা একেবারেই কি আসেনি? হয়তো ভুলে যাওয়ার স্বভাবই আমাদেরকে সহজে ভুলিয়ে দিয়েছে—গনগনে আগুনের সেই প্রথম জেগে ওঠার কাঁচা বয়সে ; নিঃসঙ্গ ,অসহায়, নতমুখ,বাক্যহীন ,অবস্থায় অগ্নি উপত্যকা পেরিয়ে আসার কৈশোরক স্মৃতি। সময়ের প্রলেপে শুকিয়েও গেছে ক্ষত হয়তো এতদিনে। ভুলে যেতে আমার সহজেই পারি। কিন্তু সম্ভবত অতি কষ্ট করেও পেরে উঠি না সঙ্কটকালে অগ্রজের দায়িত্ববোধে সমবেদনার শান্তিজলের মতো এমনতর স্বান্ত্বনার স্তোত্রবাক্য ( কোনোমতেই স্তোকবাক্য নয় ) উচ্চারন করতে স্ব-স্ব সহোদরার প্রতি ! নাবালিকার বোকামিকে সাধারনত পাকামি ঠাউরিয়ে তার আকাঙ্ক্ষার গলা সজোরে টিপে ধরার মাধ্যমেই তো পৌরুষ প্রকাশের সহজ সুয়োগ পেয়ে যাই আমরা?

আর সেই সামগ্রিক হদয়হীনতার বিরুদ্ধে আমাদের বুকে হাত রেখে , ভালবাসার শিক্ষা দেবার জন্যই বোধহয় সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে ‘সহোদরা’র মতো কবিতাগুলি। ভাইফোঁটার দিনে ভাইয়েই মঙ্গলকামনায় উচ্চারিত মন্ত্রের মতো, এ কবিতাও আসলে সহোদরার মঙ্গলকামনায় বড়োদাদা বা দিদির উচ্চারিত মন্ত্রই হয়তো-বা! আবার এ কবিতা তো সহোদরার প্রতি অঙ্গীকারও বটে। সহোদরার প্রতি সহানুভূতি, সস্নেহ-সমবেদনা ,সংবেদনশীলতার সঙ্কেত । সহযোগিতার আশ্বাস । বয়েসে বড়ো হওয়ায় সুবাদে প্রভূত্বের বদলে ঊপযুক্ত পরিণতিতে সহোদরাকে পৌঁছে দেবার সপ্রাণ জাগরী । স্নেহ সম্পর্কে সততায় এ’ কবিতার সিদ্ধি সবিশেষ বিশেষণের অতীত । সহোদরার প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বের শিক্ষাতেও এ’ কবিতা তুলনারহিত।

বঙ্গদেশে থিয়েটারের সূচনাপর্বে বিদেশিদের প্রভাব গৌতম মণ্ডল

 গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

থিয়েটার শব্দের সঙ্গে বাঙালিরা প্রথম পরিচয় লাভ করেছিল বিদেশিদের প্রভাবে। বিদেশিরা বঙ্গদেশে থিয়েটার নিয়ে আসার পর থেকেই থিয়েটার শব্দটি বাঙালি জীবনের উপর এক অভিনব প্রভাব ফেলেছিল। যে জায়গায় দর্শকদের দেখানোর জন্য নাটকের অভিনয় করা হত তাকেই থিয়েটার বলা হত। তবে একথা সত্যি যে, নাটকের উদ্দেশ্যে থিয়েটার তৈরি হলেও নাটকই কিন্তু থিয়েটারের প্রাণ নয়। তার কারণ নাটকের অভিনয় ছাড়াও থিয়েটারে আরও অনেক গুরিত্বপূর্ণ বিষয় থাকে। আবার একথাও ঠিক যে নাটকের অভিনয়ের জন্যই কিন্তু থিয়েটার তৈরি হয়েছিল। অভিনয় হল নাটকের মহাত্মা। এই অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন একটি প্রেক্ষাগৃহ, যেখানে অভিনেতা, দৃশ্যপট, সাজসজ্জাকর আলো ইত্যাদি নানা উপকরণের মিশ্রণ যাকে থিয়েটার বলা হয়েছে। আবার দেখা যায় নাটকের অভিনয়কে সুন্দর ও সরস ভাবে দর্শকের সামনে প্রকাশ করার জন্য একজন প্রযোজকের প্রয়োজন। এ থেকেই বোঝা যায় থিয়েটার একটি যৌথশিল্প। আমাদের বঙ্গদেশে এক সময় মানুষ মনোরঞ্জনের জন্য কবিওয়ালাদের আসর বা যাত্রাগানের আসর বসাত। ইংরেজ আগমনের পূর্বকাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই ইংরেজ আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে কোন প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার বা মঞ্চের পরিচয় পাই না। ইংরেজরাই প্রথম বঙ্গদেশে থিয়েটারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

 বাংলায় বিদেশি নাট্যশালার সূচনা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কোনো একটা সময়ে। এবং তা খুব সম্ভবত পলাশীর যুদ্ধের আগেই। এই ধরনের প্রথম প্রয়াস ওল্ড প্লে হাউস (old play house)। তবে এর আগে আমাদের দেশে নাট্যাভিনয় যে হত না এমন কথা বলা যায় না। কেননা, চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়, স্বয়ং চৈতন্যদেব অভিনয় করতেন। যেমন তিনি নদীয়ায় থাকাকালীন ‘রুঙ্কিনীহরণ’ এবং ‘ব্রজলীলা’র অভিনয় করেছিলেন। নীলাচলবাস কালেও ‘ব্রজলীলা’ এবং ‘রাবন বধ’ পালায় তিনি অভিনয় করেছিলেন বলেও জানা যায়।

 পুরানে কথিত আছে ভারতবর্ষে প্রথম নাটকের অভিনয় ব্রহ্মার নির্দেশে ভরতমুনির চেষ্টায়। ‘ইন্দ্রধবজ উপলক্ষে দেব ও অসুরের কাহিনী অবলম্বনে এই নাট্যাভিনয় হয়। নাটকটি রচনা করেন স্বয়ং ভরতমুনি। মহাদেবের নির্দেশে এতে ‘কৈশিকী বৃত্তি’ বা নাচগান যুক্ত হয়। এই নাটকে নিজেদের পরাজয় দেখে অসুরেরা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন ইন্দ্র তাদের ধ্বজদত্ত প্রহারে পরাজিত করেন। এই পুরাণ কথা আমাদের নাট্যাভিনয়ের প্রাচীনতার ইঙ্গিতবাহী হলেও আধুনিক ধরনের নাটকের অভিনয় মূলত বিদেশিদের দ্বারা। এই জাতীয় প্রয়াসে দেখা যায় নাটক, অভিনেতা, দর্শক, মঞ্চসজ্জা সবই ছিল বিদেশি। ভারতীয়দের কোনো প্রকার সংযোগ ছিল না।

 অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বা তারও কিছু আগে বা পরে তখনও কলকাতার বুকে বসবাসকারী ইংরেজদের সংখ্যা খুব বেশি হয়ে উঠেনি। কিন্তু ইংরেজরা আমোদ-প্রমোদের উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। ফলত খুব অল্প সংখ্যক ইংরেজ হয়েও বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে থিয়েটার তৈরি করে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেননা ইংল্যান্ডে ইংরেজদের যে থিয়েটার ছিল তা দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছিল। ইংরেজরা ছিলেন আসলে নাটক-পাগল। ফলে ইংরেজরা যেখানেই একটু সুস্থিতি ভাবে বসবাস করার সুযোগ পেতেন সেখানেই তাঁরা থিয়েটার তৈরি করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। কেননা তাঁরা ইংল্যান্ডের বাইরে বসবাস করলেও ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যকে প্রকাশ করেই চলতেন। কলকাতায় বসবাস করলেও এক সময় তাঁরা বঙ্গদেশে তথা কলকাতায় থিয়েটারের জন্ম দিয়ে অভিনয় করতে শুরু করলেন।

 ইংরেজরা যে সময় কলকাতায় অভিনয়ের জন্য থিয়েটার চালু করলেন তখনও পর্যন্ত বাঙালিদের কাছে থিয়েটার ছিল অজানা-অপরিচিত একটি বিষয়। ফলে সেই সময় কলকাতার বিশিষ্ট বাঙালিদের মধ্যে কেউ কেউ এই থিয়েটারে গিয়ে অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন। থিয়েটারে নিমন্ত্রিত দর্শকের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল ততই ইংরেজরা থিয়েটারকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করলেন। ইংল্যান্ডের অনুকরণে ইংল্যান্ড থেকে নট-নটীদের আনবার ব্যবস্থা করলেন। অভিনয়ের সময়েও অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাজ-পোশাক, যন্ত্রানুসঙ্গ, সঙ্গীত এবং সর্বোপরি ইংল্যান্ডের নাট্যাভিনয়ের মতো করেই কলকাতার থিয়েটারেও অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। মঞ্চের সামনে বসার জন্যও আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক সময় ইংরেজরা কলকাতায় এই থিয়েটারকে নিয়ে খুব বেশি মেতে উঠলেন। যে সমস্ত ইংরেজরা কলকাতায় থিয়েটার নিয়ে খুব মেতে উঠলেন তাঁদের মধ্যে কেউ মৌলিক কোন নাটক রচনা করতে পারেননি, বরং সেই সময় ইংল্যান্ডের থিয়েটারে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হত সেই সকল নাটকগুলোকেই কলকাতার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য দেখানো হয়েছিল।

 প্রথম নাট্যশালা ওল্ড প্লে হাউস। বর্তমান লালবাজার অঞ্চলে সেন্ট এণ্ড্রূজ গির্জার উল্টোদিকে এই নাট্যালয় তৈরি হয়েছিল। ১৭৫৬ সালে সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণকালে মঞ্চটি ধবংসপ্রাপ্ত হয় বলে অনুমান। মিস্টার উইল নামে জনৈক চিত্রশিল্পীর আঁকা একটি ছবি (১৭৫৩) থেকে এই মঞ্চের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অ্যামেচার গোছের লোকেরাই সাধারণত এই থিয়েটারে অভিনয় করতেন। নাট্যশিল্পী ডেভিড গ্যারিকের কাছ থেকে এই থিয়েটারের পরিচালক সাহায্য ও পরামর্শ লাভ করতেন। এই থিয়েটারটি যেখানে গড়ে উঠেছিল সেখানে বর্তমানে মার্টিন বার্ন কোম্পানির অফিস বাড়ি।

 দ্বিতীয় নাট্যশালা কলকাতা থিয়েটার বা দি নিউ প্লে হাউস। এর স্থায়িত্বকাল ১৭৭৫ থেকে ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জর্জ উইলিয়ামসন। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং এর পেছনে লায়ন্স এলাকায় এটি স্থাপিত হয়েছিল। হিকি সাহেবের ‘বেঙ্গলী গেজেট’ এ ১৭৮০ খ্রী: প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় এই থিয়েটারের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সেই সময়ের বিশিষ্ট ইংরেজ ব্যক্তিবর্গ চাঁদা তুলে মঞ্চটি তৈরি করেন। এক একটি শেয়ারের দাম ছিল প্রায় হাজার টাকা। এই নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন বারওয়েল, হেস্টিংস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। চিত্রশিল্পী মেসিংক কে আনা হয় দৃশ্যপট অঙ্কন করার জন্য। দর্শকের অভাবে পরবর্তীকালে মঞ্চটি বন্ধ হয়ে যায় (১৮০৮)।

 এই থিয়েটারেই সর্বপ্রথম ‘Subscription Performance’ প্রথা চালু করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল অভিনয়ের আগেই দর্শকের আসন নির্দিষ্ট করে নেওয়া। ১২০ টাকা ছিল টিকিটের মুল্য। এই টিকিটে একজন পুরুষ ও তার পরিবারের মহিলারা পরপর ছয়টি নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ পেত। কেননা সেই সময় ইংরেজদের সংখ্যা ছিল খুব কম, ফলে থিয়েটারকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। এই থিয়েটারে যে সকল নাটকের অভিনয় হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল- সেক্সপিয়রের ‘দি মার্চেন্ট অব ভেনিস’ ‘ওথেলো’ ‘ম্যাকবেথ’ ‘হ্যামলেট’ নাট্যকার সেরিডানের ‘স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল’। এছাড়াও ‘দি ফেয়ার পেনিটেণ্ট’ ‘দি প্যাডলক’ ‘দি পুওর সোলজার’ ‘দি সিটিজেন’ ‘দি মাইনব’ ‘লাইফ মাস্টার লাইফ সন’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

 তৃতীয় নাট্যশালা মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জন ব্রিস্টোর পত্নী এমা ব্যাংহাম ব্রিস্টো। তিনি বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। তিনি তাঁর চৌরঙ্গীর বাড়িতেই রঙ্গলয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১লা মে ১৮৮৯ খ্রি: মঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে স্ত্রী চরিত্রে মেয়েরা অভিনয় করেন। এমনকি পুরুষ চরিত্রেও মেয়েরা অভিনয় করেন। ‘ পুওর সোলজার’ ‘সুলতান’ ‘প্যাডলক’ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় এখানে হয়েছিল। এই থিয়েটারের সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মহিলা দ্বারা পরিচালিত সাহেবদের জন্য এটি প্রথম থিয়েটার। এই থিয়েটারেই সর্বপ্রথম অভিনেত্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন। থিয়েটারে মহিলাদের অভিনয়ের উপর কোম্পানির যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, এই থিয়েটারের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম উঠে যায়।

 চতুর্থ নাট্যশালা লেবেদফের বেঙ্গলী থিয়েটার। এর প্রতিষ্ঠাতা গেরাসিম বা হেরাসিম লেবেদফ যিনি রাশিয়ার লোক ছিলেন। তিনি ১৭৯৫ খ্রি: বর্তমান এজরা স্ট্রিটে জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়ি ভাড়া নিয়ে ‘দি বেঙ্গলী থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম যে নাটকটি অভিনিত হয়েছিল তা হল ‘The Disguise’ এর বাংলা রূপান্তর ‘কাল্পনিক সংবদল’। এই নাট্যশালার জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্যালকাটা থিয়েটারের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ক্যালকাটা থিয়েটারের ম্যানেজার রোওয়ার্থ লেবেদফের বেঙ্গলী থিয়েটার পুড়িয়ে দেবার চক্রান্ত করেন। এবং ২১ শে মার্চ ১৭৯৬ এ ২য় অভিনয়ের পরে মঞ্চটি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

 বেঙ্গলী থিয়েটারের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫। এদিন অভিনীত হয়েছিল ‘The Disguise’ এর বাংলা অনুবাদ করা কাল্পনিক সংবদল এর। এই অভিনয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল ৫ নভেম্বর ১৭৯৫। এই বিজ্ঞাপন থেকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাওয়া যায়-

১। রঙ্গমঞ্চটি বেঙ্গলী স্টাইলে সাজানো হয়েছিল।

২। অভিনয়ের জন্য অভিনেতা, অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হয়েছিল।

৩। প্রত্যেক দৃশ্যের আগে ও পরে রহস্যপূর্ণ সংলাপের অবতারণা করা হয়।

৪। ভারতচন্দ্র রায়ের কিছু কবিতার আবৃত্তিও করা হয়েছিল।

৫। বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনয় শুরু হত রাত ৮ টায়।

৬। বক্স, পিট ও গ্যালারীর টিকিত ব্যবস্থাও ছিল।

 পঞ্চম নাট্যশালা হোয়েলার প্লেস থিয়েটার। ১৭৯৭ খ্রি: এর ২১ শে ফেব্রুয়ারি মাসে এই মঞ্চটির উদ্বোধন হয় এবং চলে পরের বছর পর্যন্ত। প্রথম যে নাটকটি অভিনিত হয় সেটি হল ‘ দি ড্রামাটিষ্ট’ নামক একটি প্রহসন। এর পরে আরো দশ বারোটি নাটকের অভিনয়ের কথা জানা যায়। এই থিয়েটারকেও টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় ‘Subscription’ প্রথা চালু করা হয় এবং তার সঙ্গে টিকিটের মূল্যও অনেকটা কমানো হয়। তাছাড়া এই থিয়েটারে কেবলমাত্র অভিজাত ইউরোপিয়ানদের প্রবেশাধিকার ছিল, সাধারণ দর্শকের প্রবেশাধিকার এখানে ছিল না। একদিকে দর্শকের সংখ্যা সামান্য, তার উপর আবার সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এর ফলে লোকসানের মধ্যদিয়ে থিয়েটারটি বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। এক বছরের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ থিয়েটারটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এই এ এই

 ষষ্ট নাট্যশালা এথেনিয়াম থিয়েটার। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১২ খ্রি: এর ৩০ শে মার্চ। এই মঞ্চটি চলে প্রায় দুই বছর ধরে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মিস্টার মরিস। ১৮ নং সার্কুলার রোডে এই মঞ্চটি তৈরি হয়। প্রথম রাতে অভিনিত হয় দুটি নাটক- ‘আর্ল অফ এসেক্স’ ও ‘রেজিং দি উইন্ড’। দর্শক আসন পুরোপুরি দুশো ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন একজন মালিক এই থিয়েটারকে বেশিদিন চালাতে পারেননি। বেশ কয়েকবার মালিক বদল হওয়ার ফলে এই থিয়েটারের প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে যায়। এই থিয়েটারের মালিকানা নিয়ে তিনবার হাত বদল হলেও শেষবার প্রথম মালিক মিস্টার মরিস আবার এই থিয়েটারকে কিনে নেন এবং নতুন করে চালানোর চেষ্টা করেন। মিস্টার মরিসের ঝোঁক ছিল বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি। তা সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থ হলেন শুধু মাত্র নিপুন শিল্পীর অভাবে। এর পর এই থিয়েটারটি কিছুদিন চলবার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ উঁচুমানের অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভাব, পাশাপাশি চৌরঙ্গী থিয়েটারের সাফল্য।

 সপ্তম নাট্যশালা চৌরঙ্গী থিয়েটার। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫ নভেম্বর ১৮১৩ খ্রি:। প্রায় ২৭ বছর সাফল্যের সঙ্গে নাট্যপ্রিয় মানুষদের আনন্দ দান করে মঞ্চটি বন্ধ হয়ে যায় ১৮৩৯ খ্রি:। প্রথম যে নাটকটি অভিনিত হয় তা হল ‘কাসল্‌ স্টোকটার’। প্রথম দিকের রঙ্গমঞ্চগুলির অসাফল্যে ব্যথিত কলকাতার নাট্যামোদী জনগণ এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। তাদেরই উদ্যোগে চৌরঙ্গী থিয়েটারের শুভসূচনা হয়েছিল। এই থিয়েটারটির সঙ্গে যুক্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, যেমন বিখ্যাত ভারতবিদ উইলসন, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন, ইংলিশম্যান কাগজের সম্পাদক স্টোকলার প্রমুখ। ব্যক্তিগত ভাবে চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে এই মঞ্চের প্রতিষ্ঠা। দ্বারকনাথ ঠাকুর এই রঙ্গালয়টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

 প্রথম দিনের অভিনয় দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন বড়লাট লর্ড ময়রা ও তাঁর পত্নী। চৌরঙ্গী থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ সে সময়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আনবার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- স্টোকলার, পার্কার, মিসেস লীচ, গায়ক লিন্টন, কর্নেল ডয়েলি, ক্যাপ্টেন প্লেফেয়ার প্রমুখ। ফলস্টাফের অভিনয়ে প্লেফেয়ার ছিলেন অনবদ্য। ছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস গটলিয়ের, মিসেস ব্ল্যান্ড। ইংল্যান্ডের ড্রুরিলেন থিয়েটার থেকে আনা হয় মিসেস এটাকিন্সন, রয়েল থিয়েটার থেকে মিসেস চেস্টারকে আনা হয়েছিল।

 এই মঞ্চে সেক্সপিয়র, সেরিডান, গোল্ডস্মিথ, কোলম্যান, নোয়েলস্‌ ফ্লেচার প্রমুখ নাট্যকারের নানা নাটক অভিনিত হয়। কিন্তু পরিচালনার ত্রুটির কারণে সফল এই থিয়েটারটি ক্রমশ বন্ধ হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। প্রথম বছরের শেষে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ হাজার টাকা। বড়লাটের পক্ষ থেকে বাৎসরিক ১৬ হাজার টাকা অনুদান লাভের পরেও অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্চটি একটি ইতালিয়ান অপেরা কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হয়, মাসিক হাজার টাকার বিনিময়ে। তারাও কিছু দিন চালানোর পরে লোকসানের ধাক্কায় মঞ্চটি ছেড়ে দেয়। এর পর এক ফরাসি কোম্পানি ভাড়া নেয়। কিন্তু তাদের পক্ষেও বেশিদিন চালানো সম্ভব হয়নি। শেষে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট নীলামে ওঠে চৌরঙ্গী থিয়েটার। ৩০১০০ টাকায় এটি কিনে নেয় দ্বারকনাথ। সমস্ত দেনা শোধ করে তিনি নতুন উদ্যোগে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। আবার ইংল্যান্ড থেকে মিসেস চেস্টারকে আনা হয়। থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব নেন পার্কার, ক্লার্ক এবং কার। সফল প্রযোজনার মধ্য দিয়ে মঞ্চটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মিসেস লীচ চলে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত ৩১ মে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অগ্নিকান্ডে রঙ্গালয়টি সম্পূর্ণ ধবংস প্রাপ্ত হয়।

 কলকাতায় বিদেশিদের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে চৌরঙ্গী থিয়েটারের বিরাট ভূমিকা। এই প্রথম দলবদ্ধ ভাবে সোসাইটি তৈরি করে রঙ্গালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কুশলী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আনবার চেষ্টা করা হয়। নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের ওপর প্রদান করা হয়। কিন্তু মূল ড্রামাটিক সোসাইটির ব্যর্থতার জন্য এমন এক শুভ প্রচেষ্টা পুরোপুরি বিফলে যায়। তবে দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা পরবর্তী নাট্যাভিনয়কে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। চৌরঙ্গী থিয়েটারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল অনেকটা এই সূত্রে।

 অষ্টম রঙ্গালয়টি হল দমদম থিয়েটার। ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে দমদমের মিলিটারি ব্যারাকের কাছে এই মঞ্চটি স্থাপিত হয়। আকারে ছোট হলেও মঞ্চটি সুসজ্জিত ছিল। কুশলী শিল্পীদের উপস্থিতি ও ব্যবস্থাপনার পরিপাট্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই থিয়েটার। এমনকি ইংল্যান্ডের ড্রুরিলেন থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ একে লিট্‌ল ড্রুরিলেন থিয়েটার নামে আখ্যা দেন।

 দমদম থিয়েটারের বিশিষ্ট অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন মিসেস লীচ, মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস ব্ল্যান্ড প্রমুখ। চার্লস ফ্রাঙ্কলিং ছিলেন এর প্রাণ পুরুষ। তিনি ছিলেন সমস্ত অভিনয়ে পরিচালকের ভুমিকায়। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন তিনি। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রিরা দল ছাড়তে শুরু করেন। ফলত অল্প দিনের মধ্যেই দমদম থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। এই মঞ্চে অভিনীত বিখ্যাত নাটকগুলি হল- ‘ব্রোকেন সোর্ড’, ‘দি উইল’, ‘দি ওয়াটার ম্যান’, ‘রেজিং দি উইল্ড’ প্রভৃতি।

 নবম রঙ্গালয়টি হল বৈঠকখানা থিয়েটার। এটির উদ্বোধন হয় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে। কলকাতার বৈঠকখানা অঞ্চলে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে এটি বৈঠকখানা রঙ্গালয় নামে পরিচিত হয়। থিয়েটারটির ভিতরের গঠন ও সাজসজ্জা অত্যন্ত উঁচুদরের ছিল। চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি দিয়ে গৌরবের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর এর অভিনয় হয়। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল- ‘রেজিং দি উইল্ড’, ‘দি লাইং ভ্যালেট’, ‘এ ট্রিপ টু ক্যালে’, ‘দি ইয়ং উইডো’ প্রভৃতি। খ্যাতিনামা অভিনেত্রীদের মধ্যে মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস কোহেন প্রমুখের নাম স্মরণ করা যেতে পারে যাঁরা এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

 দশম রঙ্গালয়টি হল সাঁ সুচি থিয়েটার। এর উদ্বোধন হয় ১৮৩৯ খ্রিস্তাবের ২১ আগস্ট। প্রথম অভিনীত হয় ‘ইউ ক্যান ম্যারি ইয়োর গ্র্যান্ড মাদার’ নাটকটি। এছাড়াও দুটি প্রহসনেরও অভিনয় হয়- ‘বাট হাউ এভার’ ও ‘মাই লিট্‌ল এডপ্টেড’। এই রঙ্গালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা স্টোকলার এবং মিসেস লীচ।

 প্রথমে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়। একটি হলঘরের ভিতরে চারশো দর্শক আসন বিশিষ্ট এই মঞ্চে অর্কেস্টা দৃশ্যপট ইত্যাদি তৈরি করা হয়। নির্মাণ কাজে ছিলেন মি: বলিন ও মি: বার্টলেট। মি: বলিনের অপর একটি গুন ছিল। তিনি ভালো ক্লাউন ডান্স দিতে পারতেন। এ ছিল সুঁ সুচি’র একটি বাড়তি সংযোজন যা দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারত।

 অস্থায়ী মঞ্চের এই সাফল্য দর্শনে উল্লসিত হয়ে কর্তৃপক্ষ পার্কস্ট্রিটে জমি সংগ্রহ করে স্থায়ী মঞ্চ তৈরির কাজে আগ্রহী হন। অস্থায়ী মঞ্চের সমস্ত যন্ত্রাদি এলো। এলো অর্থ সাহায্য। দ্বারকনাথ দিলেন এক হাজার টাকা, বড়লাট অকল্যান্ডও দিলেন এক হাজার টাকা। মিস্টার কলিনস, মিস্টার স্টোকলার এবং মিসেস লীচের অক্লান্ত পরিশ্রমে মঞ্চটি তৈরি হল। লন্ডন থেকে এলেন মিসেস ডিক্‌ল, মিস কাউলি প্রমুখেরা।

 এই স্থায়ী রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হয় ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ। প্রথমে যে নাটকটি অভিনীত হয় তা হল- ‘দি ওয়াইফ’। এতে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন মিসেস লীচ, হিউম, হাউয়ার্ড, সিউয়েল, স্টোকলার প্রমুখ কুশলী শিল্পী বৃন্দ। পরে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসেন বিখ্যাত অভিনেত্রী মাদাম দেরম্যাঁভিয়ে। লন্ডনের ড্রুরিলেন থিয়েটার থেকে আসেন জেম্‌স ভাইলিং। কিন্তু ‘হ্যান্ড সাম হাজব্যান্ড’ প্রহসনের অভিনয় চলাকালীন মিসেস লীচের পোষাকে আগুন লেগে যায়। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নভেম্বর তার মৃত্যু হয়। তারপরেও কিছুদিন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই রঙ্গালয়ে নানা ধরনের নাটক অভিনয় হতে থাকে। লন্ডন থেকে মিস্টার এবং মিসেস আরমণ্ডকে আনা হয়। আরও নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী আসেন। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হয়না। ক্রমশ দেনার পরিমাণ বাড়তে থাকে। মিসেস আরমল্ড কলেরায় মারা যান। ছেড়ে চলে গেলেন মিসেস ডিকল্‌, মিস্টার ভাইনিং।

 মিসেস লীচের মৃত্যুর পরে রঙ্গালয়ের দায়িত্বে ছিলেন মাদাম ব্যাকস্টার। তিনি নানা ভাবে রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন। মঞ্চে ঘোড়ার খেলা, সার্কাস ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জেমস ব্যারী নামক এক ব্যক্তিকে রঙ্গালয়টি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মিসেস লীচের অভিনয় দেখার জন্য যে আগ্রহ নিয়ে দর্শকরা থিয়েটারে আসত লীচের মৃত্যুর পর সেই আগ্রহ আর দর্শকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না। কেননা সেই সময় নাট্যাভিনয়ের জগতে লীচ ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নায়িকা। শুধু তাই নয়, ধীরে ধীরে অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যেও ঐক্যের অভাব দেখা যায়।

 জেমস ব্যারী থিয়েটারটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নানা চেষ্টা করেন। তিনি লন্ডন থেকে মিসেস লীচের কন্যা অ্যান্ডারসন কে নিয়ে আসেন। ওথেলো নাটকে ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেন বৈষ্ণবচরণ নামের এক ব্যক্তি। আর দেসদিমোনার ভূমিকায় ছিলেন লীচ কন্যা অ্যান্ডারসন। এই অভিনয়টি হয় ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট। সাবলীল ও সুনিপুন অভিনয়ের মাধ্যমে সবার মন জয় করেন বৈষ্ণবচরণ। মিসেস অ্যান্ডারসন এই থিয়েটার ছেড়ে দেওয়ার পর আবার দুর্দিন শুরু হয় সাঁ সুচির। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে এই মঞ্চে শেষ অভিনয় হয়েছিল। এই স্থানে বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত।

 এরপরে কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ থিয়েটারের কথা জানা যায়। যথা- ড্রামান্ডস একাদেমির থিয়েটার, জুভেনাইল থিয়েটার, জেমস থিয়েটার, থিয়েটার রয়াল, গ্যারিসন থিয়েটার প্রভৃতি। সীমিত ক্ষমতায় এরা নানাভাবে নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই সকল থিয়েটারগুলির মধ্যেও কোনটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। পূর্বের থিয়েটারগুলির মতোই কোন না কোন দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে মঞ্চকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য ছিল। তাছাড়া সেই সময় থিয়েটারগুলির একটা বৈরি ভাব ছিল। বিদেশিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, অনেক সময় থিয়েটারে আগুন লেগে যেত অথবা কখনও কোন অভিনেত্রীর গায়ে আগুন লেগে যেত। এর থেকে অনুমান করা পারে যে, এর পিছনে বিরোধী থিয়েটার গোষ্ঠীর অবদান থাকত। আমাদের সৌভাগ্য বিদেশিদের নাট্যাভিনয় দেখে বা তার সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত থাকায় সেই নাটকের ধারা বাঙালি জীবনের উপর গভীর প্রভাব রেখে গেছে। বিদেশিদের অনুকরণে পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে প্রচুর নাটক যেমন রচিত হয়েছে তেমনি আবার প্রচুর নাট্যমঞ্চও তৈরি হয়েছে।

 কলকাতায় বিদেশিজন্য থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্পূর্ণ ইংরেজদের তাগিদেই। এই থিয়েটারের সঙ্গে বাঙালিদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। নাতক-পাগল ইংরেজরা নিজেদের আমোদ-প্রমোদের এই থিয়েটার বা মঞ্চগুলি তৈরি করেছিলেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রী থেকে শুরু করে থিয়েটারের সমস্ত রকমের উপকরণ ছিল ইংল্যান্ডের। এর থেকে আমাদের অবশ্যই মনে হতে পারে বাঙালি জীবনের উপর এই থিয়েটারগুলি কতটা প্রভাব ফেলেছে বা আমাদের বাঙালি জীবনের উপর এই থিয়েটারগুলির প্রয়োজনীয়তা কতখানি। প্রথম দিকে বড়লোক দুএকজন বাঙালি ইংরেজদের সাহচর্য লাভ করে থিয়েটারে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের গোঁড়ার দিকে দেখা যায় বিদেশি থিয়েটারের সঙ্গে বাঙালিদের অভিনব যোগাযোগ ঘটে গেছে। ব্যবসা, দেওয়ানী, দালাল, চাকরি ইত্যাদির কারণে বাঙালি ও ইংরেজদের মধ্যে যোগসূত্র ঘটে যায়। আবার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে ধনী বাঙালি ও নব শিক্ষিত তরুণ বাঙালিদের মধ্যে বিদেশি থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে। প্রিন্স দ্বারকনাথ চৌরঙ্গী থিয়েটারের সদস্য থেকে এক সময় সেই থিয়েটারের মালিকও হয়েছিলেন। বাঙালি ধনী ব্যক্তিরা এক সময় নিজগৃহে মঞ্চ স্থাপন করে তাতে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন আনন্দের জন্য। কিন্তু দর্শকের অভাবে নাটক জমে না উঠলে ধনী বাঙালিরা এক সময় মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সঙ্গে মিশে নাট্যমঞ্চ করার চেষ্টা করলেন। এরপর থেকে বাঙালিদের মধ্যে নাট্যাভিনয় ও নাট্যমঞ্চ তৈরির এক নতুন প্রেরনা লক্ষ্য করা যায় যা আজও বহমান।

**তথ্যসূত্র -**

১/ চৌধুরী, দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।

২/ সরকার, পবিত্র, নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরস, দে’জ পাবলিশার্স, ২০০৮।

৩/ ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের সাহিত্যের ইতিহাস, দে’জ, ২০০৫।

৪/ ঘোষ, জগন্নাথ, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব, গ্রন্থবিকাশ, ১৯৯০।

৫/ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক

 এজেন্সি প্রা:লি,১৯৬৬।

**৬/** বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পাদক), বাংলা নাট্যচর্চা, বাংলার মুখ পাবলিশার্স, ২০১২।

৭/ চন্দ্র, দীপক, বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে’জ পাবলিশার্স, ২০১৪।

**দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত : প্রসঙ্গ হাস্যরস**

**আশীষকুমার সাউ**

**গবেষক, বাংলা বিভাগ**

**কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়**

সালটা ১৯০৫। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম প্রর্যায়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে নতুন জোয়ার এল। সাহিত্যের অন্য শাখার থেকে নাটকও বাদ পড়লো না। ঠিক তেমনই অন্য নাট্যকারের মতো দ্বিজেন্দ্রলালও সময়টাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। পুরনো চিরাচরিত নাট্যরচনার প্রথা থেকে তিনি অনেকটাই সরে এলেন। পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরস থেকে সরে এসে নব পথপ্রদীপ্ত বাস্তব-চেতনায় মগ্ন হলেন। দৈবলীলার স্থানে ঢুকে পড়ল ইতিহাসাশ্রিত মানব জীবনের আশা আকাক্ষার কাহিনি। বীর চরিত্রদের কেন্দ্র করে, তিনি দেশপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অন্যদের থেকে তাঁর নাটককে আর একটু আলাদা করার জন্য তিনি যোগ করলেন সার্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছা।

 দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে মোটামুটি চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়ঃ ১। প্রহসন ২। নাট্যকাব্য ৩। ঐতিহাসিক নাটক ৪। সামাজিক নাটক। প্রহসন দিয়ে তিনি তাঁর নাট্যজীবন আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ছ-খানি বিদ্রূপাত্মক নাটক ও প্রহসন রচনা করেনঃ ‘সমাজ বিভ্রাট বা কল্কি অবতার’ (১৮৯৫); ‘বিরহ’ (১৮৯৭); ‘ত্রহ্যস্পর্শ বা সুখীপরিবার’ (১৯০০); ‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৯০২); ‘পুনর্জন্ম’ (১৯১১) ও ‘আনন্দ-বিদায়’ (১৯১২)। এই প্রহসনগুলিতেই কমবেশি হাসির উপাদান যে আছে, তা আলোচনা করলে বোঝা যায়। ‘সমাজ বিভ্রাট বা কল্কি অবতার’ এর সংলাপগুলির অধিকাংশই ‘সমিল গদ্যে’ লেখা। প্রহসনটিতে নব্য-হিন্দু, ব্রাহ্ম, রক্ষণশীল, পন্ডিত ও বিলাত-ফেরত –এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপের শর বর্ষিত হয়েছে।

 দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় প্রহসন হল ‘বিরহ’। কল্কি অবতারে সামাজিক বিদ্রূপ সুস্পষ্ট ছিল কিন্তু তাকে পূর্ণাঙ্গ ও নির্দোষ প্রহসন বলা চলে না, এদিক থেকে বিরহকে ‘বিশুদ্ধ প্রহসন বলা যায়। এখানে কাহিনিকে একটু জটিল ও ঘোরালো করে তুলেছেন নাট্যকার। এর গানগুলি কৌতুকরস বা হাস্যরস ফুটিয়ে তুলেছে। ‘ত্র্যহস্পর্শ বা সুখীপরিবার’ প্রহসনটি কখনো সার্থক প্রহসন হিসেবে ধরা যায় না। হাস্যরসের মধ্যে শালীনতা বা সংযমের একান্ত অভাব। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ সমাজবিদ্রূপমূলক এক প্রহসন। বিলাত-ফেরত সমাজের ‘অর্থলোলুপতা, কৃত্রিমতা ও বিলাসতা’র চিত্র আঁকাই ছিল এই প্রহসনটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে গান গুলি বিশেষতঃ হাসির উপাদান দিয়ে রচিত। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ রচনার দীর্ঘ ন-বছর পরে ‘পুনর্জন্ম’ প্রহসনটি প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্র প্রহসনটিকে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলা যায়। নাট্যকার এই প্রহসনটির জন্য ডীন সুইফটের একটি কাহিনির কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। ‘পুনর্জন্ম’ প্রহসনে এক কৃপণ, নির্মম ও সার্থপর সুদখোরের হাস্যকর পরিণতি দেখানো হয়েছে। প্রহসনটি লেখকের মাত্রাজ্ঞান, সংযম ও অনাবিল হাস্যরসের পরিচয়বহ। ‘আনন্দ বিদায়’ প্রহসনটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ‘নন্দ-বিদায়’ নামক গীতিনাট্যের প্যারডি। এই প্রহসনে রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে ও অনুচিতরূপে আক্রমণ করা হয়েছে। এই প্রহসনটি দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পীজীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক বহন করছে।

 দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটকে হাস্যরস লক্ষ্য করা যায়। সেই সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলি হল- ‘নূরজাহাণ’ (১৯০৮); ‘মেবার-পতন’ (১৯০৮);‘সাজাহান’ (১৯০৯) ও ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (১৯১১)। নাট্যকার ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকের কোথায় কোথায় হাস্যরস তুলে ধরেছেন, তাঁর নিপুণ লেখনিশক্তির দ্বারা, তা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের হিন্দুযুগ নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকটি রচনা। ভারতেতিহাসের হিন্দুযুগ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের এই আকর্ষণ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেনঃ “মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন, ‘রায় সাহেব, এতদিন পিঁইয়াজ রসুন খাইয়ে গায় গন্ধ ক’রে দিয়েছেন, এইবার একটু ঘি আলুচাল খাইয়ে দিন না’। দ্বিজেন্দ্র উত্তর দেন, ‘আচ্ছা, এইবার তাই হবে’। দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ শ্রীযুক্ত অধর মজুমদার মহাশয় বলেন- ‘চন্দ্রগুপ্ত নাটক সেই প্রতিশ্রুতির ফল”। এই নাটকে চাণক্য চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল চরিত্র অঙ্কন প্রচেষ্টা অব্যাহত। কিন্তু ইতিহাসের উদ্দীপণা ও প্রাণশক্তি এখানে অনেকখানি মন্থর তবে হাস্যরসের দিক দিয়ে সার্থক।

 ইংরেজি সাহিত্যে হাস্যরসের যে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ আছে- Wit, Humour, Satire, Irony, Sarcasm তার যে-কোন একটি ধারায় সার্থক প্রকাশ ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে অনুসৃত হয়নি। নাটকে উচ্চাঙ্গ হাস্যরস সৃষ্টি করতে দ্বিজেন্দ্রলাল পারেন নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, ‘হাসির গান’- এর কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুবিদিত। অর্থাৎ হাসির গান যখন পৃথকভাবে বিচার্য, তখনই তা সার্থকতামন্ডিত ও রসোত্তীর্ণ। কিন্তু নাটকীয় সঙ্গীত- রূপে তাঁর সার্থকতা সংশয়াতীত নয়। ফলে তাঁর নাটকে হাস্যরস, শিল্পরসে সার্থক হয়ে যথার্থ উঠতে পারেনি। তাঁর নাটকে হাস্যরসকে Fun বা Jest এর মধ্যেই ধরা যেতে পারে। তা হালকা, লঘু, তরল, নিতান্তই Dramatic relief সৃষ্টির সহায়ক। তাই গুরুগম্ভীর নাটকের মধ্যেও তিনি সার্থক হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারেন নি। ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত নাটকের বিদূষক-জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে গুরুগম্ভীর নাটকের মধ্যেই মাঝে মাঝে তরল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। ডঃ রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেছেন- “তিনি রাজা-বাদশাদের সভাগৃহে আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বয়স্যদের নিম্নশ্রেণির স্থূল ভাঁড়ামির অনেকগুলি বিশেষত্ববর্জিত, মৌলিকতাহীন ছবি এঁকেছেন। চিত্রগুলি হয়তো দর্শকদের স্থূল মনোরঞ্জন বৃত্তি চরিতার্থ করেছে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এই ধরণের হাস্যরসের কোন সার্থকতাই নেই”।

 ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে প্রধানতঃ কাত্যায়ন ও বাচাল-চরিত্র দুটির মধ্যেই হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান পাওয়া যায়। এই হাস্যরস সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে আত্মশক্তি সম্পর্কে শ্লাঘা, নির্বুদ্ধিতা, কাপুরুষতা, ভাঁড়ামি, বিদ্রূপ, বাতিকগ্রস্ততা ইত্যাদি। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা আতিশয্য দোষে ভাঁড়ামির স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে। কাত্যায়নের হাস্যরসের উপাদান তাঁর পান্ডিত্যের বাতিক। ‘পাণিনি’র সূত্র তিনি সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে চান এবং গুরু-লঘু সব ব্যাপারেই ‘পাণিনী’র সূত্রানুসারে ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে চান। এই বাতিক বা মাত্রাহীন অনুরাগ হাস্যরস সৃষ্টির উৎস। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে কাত্যায়নের এই ‘পাণিনী’- বাতিক স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস সৃষ্টির করতে পেরেছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে চাণক্য ও কাত্যায়নের কথোপকথনে এই হাস্যরস ধরা পড়ে- যেমন,-

“ চাণক্য । নন্দ তোমায় কারারুদ্ধ ক’রেছিলেন কেন, তা আমি এখন কতক বুঝতে পার্ছি।

 কাত্যায়ন। কেন?

 চাণক্য । তোমার এই পাণিনীর জ্বালায়। তুমি বসে’ বসে’ পাণিনী আওড়াচ্ছাই, আওড়াচ্ছই। রাজ্যে মড়ক এলো-পাণিনী। যুদ্ধ হ’ল- পাণিনী। অতিবৃষ্টি হ’ল- পাণিনী। অনাবৃষ্টি- পাণিনী। মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের কলহ- পাণিনী। আমি শুনেছি রাজা নন্দ শেষে তোমার পাণিনীর জ্বালায় অস্থির।

কাত্যায়ন। অস্থির কি রকম?

চাণক্য । শুনেছি যে তোমার পাণিনীর জ্বালায় রাজার শেষে শূল বেদনা ধর্ল; মাথা ঘুরতে শুরু কর্ল; খেয়ে ঢেঁকুর উঠতে লাগল। তিনি শেষে নিরুপায় হ’য়ে তোমায় কারারুদ্ধ কর্তে বাধ্য হ’লেন-পাণিনী ঐ ভুল করেছিলেন।

কাত্যায়ন। কি ভুল?

চাণক্য । অতবড় একখানা ব্যাকরণ লেখা, যা কোন ভদ্রলোক মুখস্থ কর্তে পারে না।

 কাত্যায়ন। দুঃখের বিষয়ে তুমি কিছু জান না। পাণিনীর সূত্রগুলি—” (দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

 আবার হেলেন এবং সেলুকসের কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে একটা স্মিত হাস্যরসের প্রকাশ ঘটেছে ও কন্যা-পিতার মধুর সম্পর্ককে মধুরতর করে তুলেছে। সেলুকসের অজ্ঞতাকে গোপন করার চেষ্টা এবং হেলেনের কাছে বারবার তার ধরা পড়ার মধ্যে যে একটা কৌতুককর আবহাওয়া আছে, দর্শক তা সপ্রসন্ন মনে গ্রহণ করে এবং এই হাস্যরস সৃষ্টির মূলে রয়েছে অসঙ্গতি। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে, প্রথম দৃশ্যে সেলুকস ও হেলেনের মধ্যে যে কথোপকথন তা তুলে ধরা যেতে পারে।–

“সেলুকস। ডিমস্থিনিস বলেছেন, বিজিগীষা মানুষের একটা মহৎ প্রবৃত্তি।

 হেলেন । কোথাও তিনি একথা বলেন নি ! নিয়ে আসছি ডিমস্থিনিস ।

 সেলুকস। না না, নিয়ে আসতে হবে না। তুমি ডিমস্থিনিসও পড়েছো?

 হেলেন । পড়েছি।

 সেলুকস। তুমি এত পড় কেন? পড়ে’ পড়ে’ তোমার মৌলিকত্ব নষ্ট কর্ছ।

 হেলেন । মৌলিকতা নষ্ট হয় প’ড়লে? আর না পড়লেই মৌলিক হয়! বাবা, তা হ’লে সবার চেয়ে মৌলিক হচ্ছে – ঐ- ঐ গাধাটা !” (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

 বাচাল-চরিত্রের মধ্যে হাস্যরসের উপাদান সবচেয়ে বেশী। সে ভীরু হওয়া সত্ত্বেও নন্দের শ্যালক বলে গর্বে মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। মুখে আস্ফালন করলেও কাপুরুষতা তার চরিত্রে মজ্জাগত। সে নন্দের শ্যালক হলেও নন্দের পারিষদ দলেরই একজন। পরথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে পারিষদের কথাবার্তা এবং বাচালের কথাবার্তার মধ্যে ও তার দাপট প্রকাশের মধ্যে অসঙ্গতিই হাস্যরসের উপাদান। যেমন, বাচাল বলেছে – “আমায় তুমি সহজ লোক ঠাওরাও? আমি মহারাজের শ্যালক, মহারাজের বাপ আমার বাপএর বেয়াই; মহারাজ আমার ভগ্নীপতি, মহারাজের ছেলে আমার ভাগিনেয়; তুমি আমায় সহজ লোক ঠাওরাও, ঠাকুর”। একই বক্তব্যের বারবার উল্লেখ বা আতিশয্য এখানে হাস্যরসের উপাদান। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে কারাগারে নন্দ ও বাচালের কথা বার্তার মধ্যেও হাস্যরসের উপাদান রয়েছে-

“নন্দ । তোমার কি ভয় কর্ছে না বাচাল?

বাচাল। কিছু না। মহারাজকে হদ্দমদ্দ বধ কর্বে। তা’র বাড়া আর ত কিছু কর্তে পার্বে না। তা’তে আর আমার ভয় কি? আমার ভগ্নী বিধবা হবে, এই যা।

 নন্দ । ও! তুমি ভাবছো আমায় তারা বধ কর্বে, আর তোমায় ছেড়ে দেবে?

বাচাল। মহারাজ ঠিক অনুমান ক’রেছেন।

 নন্দ । তা মনেও করো না।

বাচাল। এঁ -!

 নন্দ । তুমি চন্দ্রগুপ্তের মাতার কেশাকর্ষণ করেছিলে।

বাচাল। এঁ করেছিলাম না কি?

 নন্দ । তুমি চাণক্য পণ্ডিতের শিখা ধরে’ টেনেছিলে।

বাচাল। কৈ – না ।

 নন্দ । তার উপর তুমি আমার শ্যালক।

বাচাল। তাই নাকি !

 নন্দ । আমায় যদিও ছাড়ে তোমার ছাড়বে না।

বাচাল। এঁ (করজোড়ে) মহারাজ !” ( তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

বাচালের নির্বুদ্ধিতা এখানে ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত। নিজের সম্পর্কে সে এত নিশ্চিত যে, মহারাজের মৃত্যুতে তার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু নিজের মৃত্যুর কথা শোনার অর তার ভীতিজনক আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন এবং নন্দের কথাতেই তার এই ভাঁড়ামি যে আতিশয্য দোষে দুষ্ট, তা স্বীকৃত হয়েছে। নন্দ বলেছেন,- “এই আসন্ন বিপদেও তোমার ভাঁড়ামিতে আমার হাসি পাচ্ছে’’। এই ভাবে নন্দ ও বাচালের মধ্যে দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল, ঐতিহাসিক নাটকেও হাস্যরসকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

 বীর-ধীরোদাত্ত চন্দ্রগুপ্ত, কূটকৌশলী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাণক্য, বীর্যবান এবং পৌরুষের প্রতিমূর্তি আণ্টিগন্‌স ও বাৎসল্যের আধার সেলুকস অপার মাতৃত্বের প্রতীক মূরা প্রমুখ ‘above common level’-এর চরিত্রগুলি; হত্যা-ষড়যন্ত্র-যুদ্ধ-প্রেম-মিলনের ঘটনাগুলি; সংলাপের অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নাটক্ষানির হাস্যরসকে নির্দিষ্ট এবং নিত্য ব্যবহারে পরিচিত সংজ্ঞার মধ্যে ধরে রাখেনি। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে হাস্যরসের মধ্যে, দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিজেন্দ্র-মানস ও যুগের পটভূমিকাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।‘চন্দ্রগুপ্ত’নাটকে হাস্যরস, নাটকের সঙ্গে সংগতি রেখে নাট্যকার ঘটনাবলী ও চরিত্রগুলি ক্রমশ প্রকাশিত করে, নাটককে মনোরঞ্জন করে তুলেছেন। কোথায়ও হাস্যরসের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে নাটকে স্থূলতা আসেনি। এইখানেই নাট্যাকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুনিপুণ লেখনী শক্তির পরিচয় মেলে। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অন্য সব নাট্যাকার থেকে একটু অন্যরকম।

গ্রন্থঋণ-

১। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা - অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল।

২। নাটক ও নাট্যকার - অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস - ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

৪। দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত - অধ্যাপক শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় চন্দ্রগুপ্ত - শ্রী সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত)

সোহাগিনীর সঙ্গে এক বছর : আত্মপ্রকৃতিতে

 বিশ্বরূপ

টুম্পা ব্যাপারী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

 আমরা যা কিছু শিখি তাই শিক্ষা। পরিবার, বই, সিনেমা, অভিজ্ঞতা, ঘটনা সে যেখান থেকেই হোক না কেন। হতে পারে সে শিক্ষা ভালো পথের কিংবা মন্দ পথের। অক্ষরজ্ঞানে শিক্ষিত মানুষই বিচার করে সে কোন পথকে বেছে নেবে। কিন্তু দেখা যায় ক্ষমতা, লোভ, প্রাপ্তির আশায় কখনও কখনও এই শিক্ষিত মানুষেরা অশিক্ষিতের মত আচরণ করে ফেলে। আর তখনই দেখা যায় সংঘাত। স্বাধীনতা পরবর্তী উপন্যাসিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সোহাগিনীর সঙ্গে এক বছর’ উপন্যাসেও সেই প্রাপ্তির খেলায় মত্ত চরিত্র গুলোকেই দেখব বিভিন্নভাবে। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই শিক্ষিত, সাধারণ চরিত্রের স্থান সেখানে কম। প্রধান চরিত্র কবি-স্কুল মাস্টার বিশ্বরূপ। তারই জীবনের উত্থান ও পতনের আবর্তে ঘূর্ণায়মান মানুষের প্রতীকিও প্রকৃতিকে আমরা দেখব। কখনও সেলিব্রেটি হওয়ার লালসায় শীর্ষের মত বন্ধুরাও এক মুহুর্তের মধেই পর হয়ে যায়। আবার রোহিতে মত বন্ধুরা ব্যাল্যান্স করে চলে কার সঙ্গে থাকলে বেশি সুবিধা। অথচ দুজনের সামনেই নিজেকে সৎ এবং কিছু করতে না পারার অভিনয় করে যায় খুব ভালোভাবে। ২৯শে জানুয়ারি কলকাতা বই মেলার লিটিল ম্যাগাজিনের কাছে গিয়ে বিশ্বরূপ নিজেরদের প্রকাশিত পত্রিকাটি হাতে তুলে নেয় গভীর আগ্রহে কিন্তু পত্রিকার প্রথম পাতায় তার লেখা কবিতা না থাকায় একটু অবাক হয়। পরমপ্রিয় বন্ধু রোহিতের কাছে জানতে পারে দীর্ঘদিন পত্রিকা অফিসে কোন যোগাযোগ না রাখার কারণে এই শাস্তি। বাবার মৃত্যুর চার মাসের মধ্যে এমন একটা আঘাত পায় বিশ্বরূপ। আসলে ব্যাপারটা ছিল, বিশ্বরূপ খুব ভালো কবিতা লেখে সেটা শীর্ষ মেনে নিতে পারেনি। তাই দলকে নিজের দিকে নিয়ে বিশ্বরূপের নামে গুজব রটায় সে তাদের বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সারারাত ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শুনতে গিয়েছে। আর তাতেই দল তাকে বহিস্কার করেছে। বন্ধুর বাবা মারা গিয়েছেন এমন অবস্থায় তার পাশে না থেকে অবস্থের সুযোগ নিতে বাধেনি শীর্ষের। সে জানত বিশ্বরূপ বরাবরই শান্ত, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। বড় জোর একটু কাঁদতে পারে। তাই কোন অসুবিধা হবে না। রঙিন দুনিয়ায় আমরা সবাই ফার্স্টকেই মাথায় করে রাখি। তাই পাঠকরা বিচার করল না, প্রতিবাদ করল না কবির কবিতার মর্যাদা নিয়ে। অথচ প্রায় এক বছর পর মহাকাল পত্রিকাতে সুরঞ্জন নায়েক যখন বিশ্বরূপের কবিতা নিয়ে গালাগালি দিয়েছে তখন প্রমাণ হল সে কোন অন্যায় করেনি, তাকে আবার দলে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে। রোহিতের এক কথায় বিশ্বরূপ বললেন-‘আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, কিন্তু এত গালি খেয়ে আমার লাভ কী হল?’ রোহিত বলেছিল-‘ লাভ হল না? সুরঞ্জন নায়েক আমাদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতার বড় চামচা। সে তোকে এত গালাগালি দিচ্ছে মানে তোর সঙ্গে ওদের গ্রুপের কারওই কোনও সম্পর্ক নেই।’

 বাবার মৃত্যুর শোক আর প্লান করে দল থেকে বাদ দেওয়াতে বিশ্বরূপের গলার কাছে কান্না গুটিয়ে আসছে এমন সময়-‘ একটা অটোগ্রাফ দেবেন প্লীজ’ এমন একটা কথায় অবাক হয়ে যায় বিশ্বরূপ। তরী ভেসে যাওয়ার সময় পিছন থেকে ডাকার মত অনেকটা। এক সুন্দরী মেয়ে দুটো বই এগিয়ে দিয়ে বলল। নাম সোহাগিনী। বিশ্বরূপের শুকনো বুকে যেন জোয়ার এল। ধীরে ধীরে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সরে গিয়ে সোহাগিনীর প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। তবে আপাতত সেটা এক তরফা। সে বাস্তববোধ সম্পন্ন। অকারণে ভেসে যাওয়ার ইচ্ছা তার নেই। তাই সত্যি করে প্রেমে পড়েছে কিনা তা বোঝার জন্য পরখ করতে চাইল অনেকবার অনেকভাবে। তিতাস তার পুরানো ছাত্রী। সোহাগিনীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা জানতে চাইলে তিতাস বলে-‘ তোমার সঙ্গে এগিয়ে এসে কথা বলল, তোমার অটোগ্রাফ চাইল, আর ধরে নিলে তোমার প্রেমে পড়েছে? বিয়ে? একবার দেখাতেই বিয়ে? প্রেম না, ঘোরাঘুরি না, ডেটিং না, প্রথম সাক্ষাতেই বিয়ে?’ শুধুমাত্র তাই না তিতাস এ ব্যাপারে বিশ্বরূপকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না বলে দিল। সোহাগিনীর সঙ্গে একই কোচিং এ পড়ে বর্ণনা, বিশ্বরূপের পরিচিত। হঠাৎ একদিন দেখা হওয়াতে নিজের অবস্থা ঠিক আছে কিনা পরখ করতে বিশ্বরূপ বর্ণনাকে প্রশ্ন করে-‘ ওর পাশে আমায় মানায় বর্ণনা?’ বর্ণনার উত্তর ছিল-‘দারউন মানায়। ও যে ছেলেগুলোর সঙ্গে ঘোরে সে গুলো তো হয় প্যাংলা, নয় লেডিস, কেলানে কাতির্কের দল সমস্ত। তোমার কোন টেনশন নেই বিশ্বরূপদা। তুমি ওদের চেয়ে দশগুন হ্যাণ্ডসাম।’ ক্যারি অন অয়াডভার্টাইজিং এজেন্সির অফিসে শ্রাবন্তীদির সঙ্গে দেখা হল। সোহাগিনী এসেছে একটা ইন্টারভিউ দিতে, শ্রাবন্তীদি তার জাজ। সোহাগিনী ইন্টাভিউ ভালো না দিলেও শ্রাবন্তীদি বিশ্বরূপকে বলেছিল’টু হেল উইথ হার ফাদার। চুলোয় যাক ওর বাবা। মেয়েটা যদি তোকে ভালোবাসে তাহলে এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে আসবে। প্রেম করবে একটু রিস্ক নেবে না?’ সোহাগিনীর সঙ্গে নিজের ভাগ্যের কতটা মিল আছে তা জানার জন্য শান্টুর কাছে গিয়েছে বিশ্বরূপ।শান্টুর কথায়-‘মোটামুটি যা দেখলাম ২৯টা গুণ পাচ্ছি। আমি আরও ভালো করে দেখে পরে তোকে দিয়ে আসব। তবে আবার বলছি, এই সোহাগিনী না বিনোদিনী কী নাম বললি মেয়েটার, তোর সঙ্গে ওর ছকের মিল দুর্দান্ত।’ গীল্ড অফিসের একটা আলোচনা চক্রের সঞ্চালিকা সোহাগিনী। বিশ্বরূপ তাকে প্রথম দেখাতেই বলে উঠেছিল-‘কিন্তু আমি তো বৃষ রাশি, মেষ লগ্ন। গোপনীয়তা আমার জন্মশত্রু। আমার ইচ্ছে করছিল ওই অডিটোরিয়ামের মাইকটা মুখের সামনে নিয়ে চিৎকার করে বলি, তেষ্টা পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে,আমার ত্রিরিশ বছরের সমস্ত তেষ্টা একসঙ্গে পেয়েছে।’ মোটামুটি গ্রীণ সিগন্যাল পেয়ে প্রেম থেকে বিয়ে পর্যন্ত সমস্ত প্রোগ্রাম মনে মনে সাজিয়ে নিল কবি বিশ্বরূপ।’ তিতাস বলেছিল-‘ তোমার কথা তোমাকেই বলতে হবে বিশ্বরূপদা।যদি অবশ্য বলা ঠিক মনে করো।’ সোহাগিনীর ফোনে কল করে এক পুরুষ কণ্ঠের শব্দ শুনে ফোন রেখে দেয় বিশ্বরূপ। সোহাগিনীর কথায় জানতে পারে কোন বয়ফ্রেন্ড নয় তিনি সোহাগিনীর বাবা। সংসারে মা, বোন আছে। বিশ্বরূপের আর কোন দ্বিধা থাকল না যখন সোহাগিনী নিজে থেকে বলল-‘আমার কিন্তু তলোয়ার দেখিয়ে যারা কেড়ে নিতে পারে, সেরকম ছেলেই বেশি পছন্দ। ...’বিশ্বরূপ প্রশ্ন করেছিল-‘ কী কেড়ে নেবে?’, ‘ যাকে তার পছন্দ, তাকে। অবশ্য তার আগে সে বি,এড পরীক্ষাটা ভাল করে দেবে।’ এমনটাই উত্তর দিয়েছিল সোহাগিনী। বিশ্বরূপ তখন বি,এড করছে তাই কোন সংশয় থাকল না যে কথা গুলো তাকেই বলেছে। তাদের প্রথম ডেটিং ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন। বিশ্বরূপ তখন সোহাগিনীর প্রেমে আত্মহারা। কখনো কফিসপ, কখনও রবীন্দ্রসরোবর আবার কখনও বা কলকাতা কফিহাউস। ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা, ফোনে গান শোনানো, অকারণ রাস্তায় গান গেয়ে ওঠা। দলের আবিরে রাঙিয়ে নেয় দু’জন দু’জনকে। বিশ্বরূপের কালশৌচ। তাই গিনীকে বলে-‘ আমি তোমায় সামনের বছর রঙ দেব।’ প্রেমিকাকে নয় তার মাকে খুশি করার জন্য ফোনে গান করেছে বিশ্বরূপ। শ্যালিকার জন্য ভালো ইংরেজি মাস্টার খুঁজে দেওয়া, পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের সাজেশন এনে দেওয়া সবই করেছে সে। সোহাগিনীর এম, এ পরীক্ষা তাই কোন প্রকার মানসিক চাপ না দেওয়ার জন্য সোহাগিনীর পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিশ্বরূপ, আর অপেক্ষা করতে বলে তার মা এবং দিদিভাইকে। বাড়িতে বলে রাখে সোহাগিনীর পরীক্ষা শেষ হলে তারপর তাদের বাড়িতে যাওয়া যাবে। বিশ্বরূপের প্রেম যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনই ভসকি নামের একটি ছেলের কাছে জানতে পারে সোহাগিনী চরিত্রগত ভাবে ভালো মেয়ে নয় -‘ভাল মেয়ে! সোহাগিনী ভাল মেয়ে! আপনি ওর পাল্লায় পড়েছেন বলে বুঝতে পারছেন না, ও একদম ক্যারেক্টারলেস একটা মেয়ে।’ নিজের হবু স্ত্রী সম্পর্কে এমন খারাপ কথা শুনে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে ভসকিকে আহগাত করে ফেলে বিশ্বরূপ। ক্রমশ বিশ্বরূপ বুঝতে পারে গিনী টিচারদের কাছে কেন এত ব্যস্ত থাকে। আর তাকে শুধু বড় বর আশা দিয়ে থামিয়ে রাখে। বিশ্বরূপের বই অন্যদের দিতে বারণ করলে সোহাগিনী জানায় তাতে বিশ্বরূপের নয় নিজের সুবিধা হবে বলে দিচ্ছে। এম,এ পরীক্ষার পর সোহাগিনী বিশ্বরূপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, ফোন করলে ফোনও ধরে না। হঠাৎ একদিন গিনীর মা জানিয়ে দেয় অনেক লোক ফোন করে বিরক্ত করছে বলে সে ফোন ধরে না। তাই বিশ্বরূপ যেন আর ফোন করে বিরক্ত না করে। গিনী তাদের সম্পর্ক নিয়ে এখন কিছু ভাবছে না। যখন মনে হবে কথা বলার দরকার তখন সে নিজে থেকেই কথা বলে নেবে। বাড়িতে, পাড়ায়, আড্ডায় সকলেই বোঝাতে থাকে যে গেছে তা আর ফেরার নয়, সব ভুলে গিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে কর। গিনীর সঙ্গে বিশ্বরূপ গল্প করেছিল, তার বাবা মারা যাওয়ার আগে প্যাকেটের দেরাদুন চালের ফ্রায়েডরাইস খাবেন কিন্তু বিশ্বরূপ তা খাওয়াতে পারে নি। সোহাগিনীকে বিশ্বরূপ তার জীবনে আর পাবে না এমন ভাবনায় যখন কষ্ট পাচ্ছে তখন একবার শুধুমাত্র সোহাগিনীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে –‘দম নিতে পারছি না, মরে যাব মনে হচ্ছে। মরার আগে জাস্ট একবার তোমার গলার আওয়াজটা শুনতে ইচ্ছে করছে।

ও বলল, শুধু গলার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছা করছে? মরার আগে ফ্রায়েডরাইস খেতে ইচ্ছা করছে না? নাকি পয়সা নেই? দেব?’

বিশ্বরূপ মনে মনে বলতে থাকে-‘সোহাগিনীর ভারতবর্ষে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিস্ক, কোন ম্যাডামের চোখে না পড়ে কোন স্যারকে একটু তেল দিতে হবে, গাদাগুচ্ছের জেরক্স, প্রচুর প্রচুর পড়াশোনা, ফার্স্ট ক্লাস, তারপর পি,এইচ,ডি, তারপর কলেজ পোস্টিং, তার ভিতরে সোনার গয়না, দামি পাথর, শাড়ি সালোয়ার এবং আমি।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সোহাগিনীর জীবনে নিন্মবর্গের একমাত্র প্রতিনিধি আমি। কোনও এক অজানা কারণে ও আমাকে ভালবেসেছে, আর তার পিছনে কবিতার অনেকটা ভূমিকা আছে বলে আমি কবিতার কাছে ঋণী।’

সত্যি কবি বিশ্বরূপ কবিতার কাছে ঋণী। কবিতার জন্যই সোহাগিনী তার কাছে এসেছিল। শেষে সোহাগিনীর জন্যই সে আবার প্রেমের কবিতা লিখতে শিখেছে।

 সোহাগিনী ছোট করে ডাকলে গিনী। গিনী অর্থে টাকা বা সম্পদ, অর্থ্যাৎ কিনা লক্ষ্মী। লক্ষ্মী চঞ্চলা, চিরকাল কারোর কাছে থাকতে চায় না। গিনীও তাই হয়তো কারো কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না। বিশ্বরূপও ধরে রাখতে পারে নি। বাবার মৃত্যুর শোকে স্তব্ধ বিশ্বরূপের জীবনে এসে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে তাকে শান্ত করেছে। বিশ্বরূপের জীবনের রুচিকে একটা অর্থ দান করেছে।সোহাগিনীর অনুরোধে নতুন মোবাইল কিনেছে, স্মার্ট হতে শিখেছে। এছাড়াও অকারণ গান গাওয়া, কোন পার্কে বসে গল্প করা, বন্ধুদের সামনে সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া, সিনেমা দেখা সব মিলিয়ে অন্যদেরকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশ্বরূপ। একটু উঁচুতে ওঠা মানে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গকে একটু খুশি করা। গিনীরও ইচ্ছে ছিল নাম কামাবে অর্থ্যাৎ নিজের একটা পরিচিতি বানাবে উপর মহলে। সে ইংরেজি ভাল জানে না। সুতরং সুন্দরী-স্মার্ট হলেও কোথাও যেন খামতি থেকে যায়। তার সুন্দর রূপকে সিঁড়ি করেই সব কিছু পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। আর বোকা বনে যায় সাধারণ মানুষ। বিশ্বরূপ তাদেরই একজন। সোহাগিনী জানত বিশ্বরূপ ভালো কবিতা লিখতে জানে। তাই তার কবিতার বই দিয়ে বা তার বান্ধবীর পরিচয় দিলে কোথাও না কোথাও সে সুযোগ পেয়ে যাবে- বিশ্বরূপ তার কবিতার বই দিতে বারন করলে গিনী বলে-‘আমি থোরাই তোমার কবিখ্যাতি বারানোর জন্য তোমার বই গিফট করেছি! আমি দিয়েছি আমার সুবিধের জন্য।’ সোহাগিনী জানত বিশ্বরূপ ঘরোয়া তাই তাদের সম্পর্কটা যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি পর্যন্ত না পৌঁচ্ছায় সে জন্য কৌশলে বাবা সম্পর্কে গম্ভীর কথা বলে বিশ্বরূপকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সোহাগিনী। বিশ্বরূপ কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ না করে তাই মা-কে সবসময় ভালো ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে। সেই মত গিনীকে সাবধানে রাখার কথা বলেছে বিশ্বরূপকে। দোলে নিজে হাতে করে বিশ্বরূপের কপালে আবির লাগিয়েছে সোহাগিনী। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে-‘তাহলে প্রতিজ্ঞা করো আমার অন্য কোথাও বিয়ে ঠিক হলে তুমি আটকাবার চেষ্টা করবে।’ মা কালীর ভক্ত বিশ্বরূপ সোহাগিনীকে মন্দিরে নিয়ে পুজো দিতে গিয়ে আলাদা আলাদা নামগোত্র বললে গিনী ধমক দিয়ে বলেছিল-‘দু-জনেরই শাণ্ডিল্য গোত্র। আপনি পুজো দিন ঠাকুরমশাই।’ পুজো হয়ে গেলে ঠাকুরমশাইকে বলে-‘ওর হাতের ঘড়িটায় একটু ছুঁইয়ে দিতে। তারপর মা কালীর পা থেকে একটা সিঁন্দুর লাগা জবা দিতে বলল আমার হাতে। আমি জবাটা হাতে নিয়ে ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছি, গিনি বলল,’ ‘ওটা আমার মাথায় ছোঁওয়াও, তারপর যা বলতে বলছি বলো। আমাকে ছাড়া কাউকে নয়। আমাকে ছাড়া কাউকে নয়, আমাকে ছাড়া কিছুতেই নয়।’ সোহাগিনী জানে বিশ্বরূপ কিসে খুশি হয়। সমস্ত আবেগ শেষ হয়ে যায় এম,এ পরীক্ষার পর তাই সোহাগিনী সহজেই বলতে পারে-‘ আমার না ভীষণ কনফিউশন হচ্ছে।’ এই কনফিউশন শব্দটার অর্থ বিশ্বরূপ ভালো করে বুঝতে চাইলে সোহাগিনী দাঁতে দাঁত চেপে বলে-‘ অপরাধ তো আমি করেছি। জাস্ট মেলামেশা করতে গিয়ে এত বড়ো জটিলতার মধ্যে ঢুকে গেছি।’ সোহাগিনী লোভ- লালসা অনেক তীব্র বিশ্বরূপের পক্ষে তা মেটান সম্ভব নয়। জীবন সবসময় চাওয়াকে পূর্ণতা দেয় না। সোহাগিনীর চাওয়াকেও দেয় নি। কোন কলেজের প্রফেসর নয় সে বিশ্বরূপের ছোটবেলার স্কুলে চাকরি পেয়েছে। জীবনের সঙ্গে সোহাগিনী হয়তো কম্প্রমাইস করে নিয়েছে তাই বিশ্বরূপের সঙ্গে দেখা হলে মনের কথা বলার চেষ্টা করেছে-‘তোমার হয়তো মনে হতে পারে আমি তোমায় ইউজ করেছি কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হল...’ বাকিটা আর শোনার ইচ্ছা রাখে নি বিশ্বরূপ। রাস্তা পেরোবার জন্য সোহাগিনী পা বাড়ালে-‘আমি শুধু বললাম, সাবধানে যেও।’

 বিশ্বরূপ বরাবরই শান্ত স্বভাবের। দিদির ইচ্ছাতেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা। বড় হয়ে এস,এস,সি দিয়ে স্কুলের চাকরি।বাড়িতে মা-বাবা-দিদি, বন্ধু, কবিতা এই তার সঙ্গী। ভগবানের মধ্যে মা কালীর সঙ্গেই তার সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক। ‘ছেলেবেলা থেকেই যেখানে কালীপুজো, সেখানে আমি।’ স্কুলের চাকরির পর যখন দেখল স্কুলের সামান্য দূরত্বে বহু প্রাচীন কালীবাড়ি বিশ্বরূপ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। এমনকি বি,এড পড়তে গেলে রোজ কালীবাড়িতে যাওয়া হবে না ভেবে সে বি,এড করতে যেতে চায়নি। স্কুলের অনন্তদা বিশ্বরূপের বাবা মারা যাওয়ার পর একদিন ডেকে বলেছিলেন-‘তুমি যতদিন মা কালীর আওতায় ছিলে ততদিন কিছু হয়নি আর যেই মায়ের থেকে দূরে গেলে অমনি একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, দেখলে?’ কিন্তু সোহাগিনীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তো তাকে বিশ্বরূপ মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল তবুও সোহাগিনী টিকল না। সোহাগিনীর না থাকার আর একটা কারণ হয়ত বিশ্বরূপের স্মার্ট না হওয়া, সহজ-সরল স্বভাব। সে কোন দিনও কোন মেয়ের ধারে কাছে যেতে পারে নি। শীর্ষ ও বিশ্বরূপ যখনই একসঙ্গে কবিতা পড়েছে শীর্ষের অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য মেয়েরা দলে দলে ছুটে গেছে, তার দিকে কখনও কোনদিন কোন মেয়ে আসেনি সোহাগিনী ছাড়া। শীর্ষের কথায়-‘মাইরি বলছি, একদম যৌন ঈর্ষা নেই, এরকম ছেলে তুমি ছাড়া আমি একটাও দেখিনি।

আমি ওকে বলি- তুই আমার সামনে দশটা রসগোল্লা নিয়ে বোস না। আমি ছিনিয়ে নেব।’ বিশ্বরূপ মেয়েদের থেকে একটু দূরেই থাকে। তাই তো স্কুলের অনন্ত স্যর তাকে নিয়ে মজা করে বলে-‘যখন বৃষ্টি পড়ে তখন জমি একটু আদর চায়, বুঝলে। নতুন বউকে যেমন আদর দিতে হয়, জমিকেও তেমনই আদর দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য তুমি আর বুঝবে কী করে? বিয়েই করলে না।’ স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি ‘স্বামীবিছিন্না’ এক মহিলার সঙ্গে দিব্য সম্পর্ক গড়ে নিয়েছেন। বিশ্বরূপের একটাও জোটে না। বাবার কাছেও বিশ্বরূপের প্রশ্ন ছিল-‘সবার প্রেম হয়, সবার গার্লফ্রেন্ড হয়, আমার কেন হয় না?’ বিশ্বরূপ কবি, তার মনের ভিতরে সব সময় ভাবের আনা-গোনা। তাই তো বাগবাজার মনে পড়লেই তার মনে হত ‘শ্রীশ্রীমা’ বাগবাজারের রাস্তা ধরে ‘গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন বা এই সেই গলি যা ধরে গিরিশ ঘোষ কিংবা নিবেদিতা মায়ের বাড়িতে আসতেন, আমার ভিতরে একটা শিহরণ হয়।’ অকারণ ঘাবড়ে যাওয়া বিশ্বরূপের স্বভাব। তার বন্ধু অনিডার তাতেই বিশেষ আপত্তি - ‘আমি যে অল্পে ঘাবড়ে যাই এটা অনিডার একদমই না –পসন্দ। আমাকে সবসময় বলে, হিম্মত রাখ ভাই, হিম্মত রাখ।’ ঘাবড়ে যাওয়ার কথায়- একবার জিমে যেতে গিয়ে পাড়ার কিংকরের সঙ্গে দেখা হয় বিশ্বরূপের। বিশ্বরূপ জিমে যাচ্ছে শুনে কিংকর ভীষণ মজা করে ব্যাপারটি নিয়ে-‘হ্যাঁ লোহা টেনে। তুই বারে গিয়ে বসে থাক, মাতাল হয়ে ড্রেনে পড়ে যা, পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে পাঁচ জায়গায় গিয়ে হয়ে আয়, নিদেনপক্ষে সেমিনার কর, তাই বলে ব্যায়াম? সেটা একটা কবিকে মানায়? আমি সবাইকে গিয়ে বলব। তারপর দেখ সবাই কী রকম ছি ছি করে।’ ভয় পেয়ে, ঘাবড়ে গিয়ে বিশ্বরূপ ব্যাপারটা ক্যাসুয়াল ভাবতে বলে, শুধু তা নয় কিঙ্গকরের মুখ বন্ধ করার জন্য একশ টাকা ঘুষ দেয়। সোহাগিনীর বিশ্বরূপের সঙ্গে কোনপ্রকার যোগাযোগ না রাখা এবং বিশেষ করে কনফিউশন শব্দটা বিশ্বরূপকে ঘাবড়ে দেয়। সোহাগিনীকে পাওয়ার জন্য নিজেকে পাল্টে ফেলতে রাজিও হয় সে। শেষে বিশ্বরূপ বুঝেছে সোহাগিনীর সঙ্গে তর্ক করা চলে না কারণ যেখানে প্রেম থাকে না সেখানে তর্ক করা বৃথা। অনিডা একবার বলেছিল- কোন শারীরিক চাহিদা নয় সেক্স হল সারাক্ষণ পার্টনারকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা আর বিনিময়ে আনন্দ লাভ করা। বিশ্বরূপের মনে হত সে শুধু সোহাগিনীর সঙ্গেসবসময় কথা বলেছে-‘গিনী হামেশা বলত, তুমি এত কথা বলো, এত এত কথা বলো, মনে হয় আমার মাথায় ভিতরে কে যেন হাতুড়ির বারি মারছে।’ সোহাগিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার এটা হয়ত একটা কারণ। সোহাগিনী যখন বলে-‘থুতনি নয়? ঠোঁট? ভালবাসা নয় জাস্ট মেলামেশা? রজ্জু নয় সর্প?’তখন বিশ্বরূপের আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে না।রাতে সে স্বপ্ন দেখে সোহাগিনীর সঙ্গে মহাকাশে বেড়াতে গেছে গিনী তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিয়ে বলছে-‘যাও এবার রিকশা চেপে বাড়ি চলে যাও।’ অর্থ্যাৎ বিশ্বরূপ্বের জায়গাটা বুঝিয়ে দেওয়া। মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না বিশ্বরূপ। সোহাগিনীর ফোন পেয়ে সে আবার বলতে থাকে ‘আমাদের মেয়ের নাম হবে অপেক্ষা। অনেক অনেক পথ চাওয়ার পর সে আসবে।’ এরপরও সোহাগিনী ফিরে আসেনি বরং মাকে দিয়ে আরো বাজে কথা শুনিয়েছে সে। বিশ্বরূপের মনে পড়ে যায় গিনী বলেছিল-‘আমায় যদি মনটি দেবে, রাখিয়া যাও তবে/ দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাকতে হবে।’ নতুন করে আবার জীবন শুরু করল বিশ্বরূপ। পুরীর এক সেমিনারে কবিতা পড়তে গিয়েছিল সে। এক বিহারী ছেলের কাছে ভাঙ খেয়ে’বালির গায়ে বালি দিয়ে একটা শিবলিঙ্গ তৈরি করলাম।’ পুরীতে বিশ্বরূপের সঙ্গে ছিল ডাক্তার। ডাক্তার বুঝতে পারে বিশ্বরূপ কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বরূপ তা স্বীকার করতে রাজি নয় বরং বালির একফুট ওপরে উঠে বসে শিবের গায়ে হাত দিয়ে বলতে লাগল-‘যৎ তৎ অদ্রেশং- যাঁকে স্থূল চক্ষু দ্বারা যিনি উপলব্ধ নন, অগ্রোত্রম- যিনি নির্দিষ্ট গোত্রবিহীন, অবর্নম- যিনি বর্ণরহিত, নিত্যং- যিনি অবিনাশী। বিভূং- সর্বত্র পরিব্যাপ্ত যিনি, সর্বগতং- সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট যিনি...’ ডাক্তার থামিয়ে দিলে বিশ্বরূপ আবার বলতে শুরু করে-‘সুসূক্ষ্মং- সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর যিনি, তৎ অব্যয়ং-যিনি ব্যয়হীন, ক্ষয়হীন, যৎ ভূতযোনিং-যিনিএই জীবজগতের সৃষ্টির কারণ, আমার সেই ভগবান আমার মত অসহায় নন। একবার বলুন, পুরুষ হিসাবে তিনি আমার মতো নপুংসক নন, নারী হিসেবে আমার মতো বন্ধ্যা নন, পাথর হিসেবে আমার মতো ক্লীব নন।’ সোহাগিনী একজন মেয়ে হয়ে সিভিলাইজড হয়াটাকে যেভাবে দেখে বিশ্বরূপ তা কখনও দেখতে পারে নি। আর তাই হয়ত সব কিছু সঁপে দেওয়ার মানসিকতায় ছোট থেকেই মা কালীর কাছে যেত। সোহাগিনীর কাছেও নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিল সে। জীবনের কঠিন সময়ে তাই হয়ত শিবলিঙ্গ বানিয়ে সমস্ত অক্ষমতাকে দূর করার চেষ্টা করেছে সে। বিশ্বরূপকে বলতে শুনি’আমি করপ্ট হয়েছি। এরিয়ারের টাকা পাওয়ার জন্য দুশো টাকা ঘূষ দিয়েছি। ডাক্তারবাবু আমায় বলেছেন, গরম জলে রাম মিশিয়ে খেলে বুকের কফ বেরিয়ে আসবে। ঠিক করেছি, একদিন খাব। কফ যা না- যাক, সতীপনা তো যাবে। করাপ্ট তো হওয়া যাবে।’ ‘সোহাগিনীর সঙ্গে একবছর’ সম্পর্ক রেখে কবি বিশ্বরূপ ধীরে ধীরে করাপ্ট, সিভিলাইজড হতে শিখেছে। লাভ হল না লোকসান বিশ্বরূপ বোঝে না, বোঝে শুধু - ‘ছাই! পৃথিবীর সব আগুনকে যা একসময় না একসময় পরিণতির দিকে টেনে আনে।’

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দূতীর প্রভাব

 জয়ন্ত মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে দূতী বা কুট্টিনী শ্রেণীর চরিত্র বিস্তৃত ভুমিকায় অবতীর্ন হয়ে আছে। শুধু মাত্র মধ্যযুগ নয়, যদি প্রাচীন কামশাস্ত্রাদির প্রতি নজর দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে, সেখানেও নর ও নারীর গোপনে কাম সংযোগের চেষ্টার পিছনে দূতীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মধ্যযুগের কবিদের রচনাতেও দূতী শ্রেণীর সেই একই রকম প্রভাব রয়েছে। যখন কোন নারীর রূপ সৌন্দর্য দেখে কোন পুরুষ বা কোন পুরুষের রূপ সৌন্দর্য দেখে কোন নারী প্রেম বা কাম পিপাসায় অস্থির হয়ে ওঠে তখন সেই নর ও নারীর মিলনের পথকে নমনীয় করতেই দূতী চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে মধ্যযুগের দূতী চরিত্র শুধুমাত্র নর ও নারীর কাম সংযোজনে মধ্যস্থতা করেনি, কখনো কখনো প্রেমিক ও প্রেমিকার মনের মিলন ঘটাতেও দূতী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এই দূতী শ্রেণীর দ্বারা মধ্যযুগের নর ও নারী অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। একারণেই মধ্যযুগের অনেক কবির লেখনিতে নায়ক ও নায়িকার থেকে দূতী চরিত্র অধিক পরিমানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

 মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের একাধিক বিবাহের যেমন স্বীকৃতি ছিল তেমনি ছিল প্রথমা স্ত্রীর স্বামীর বিরহে কালযাপনের স্বীকৃতি। সামন্ত প্রভুদের কাছে নিত্য নতুন নারী ছিল ভোগবিলাসের একটি বিষয়। এক্ষেত্রে কখনো প্রেমের বন্ধনে আবার কখনো কামের বন্ধনে বেঁধে রাখার কাজে মধ্যস্থতা করতে হত দূতীকে। বর্তমানে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে যেমন একের খবর অপরের কাছে সহজে পৌঁছানো হয় তেমনি ভাবে মধ্যযুগে নারী ও পুরুষের খবর একে অপরকে আদান প্রদান করা হত দূতীর মাধ্যমে। পুরুষরা যেমন নিজের স্ত্রী থাকার পরেও অন্যের স্ত্রীর প্রতি মনের দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারত তেমনি মধ্যযুগে নপুংসক পুরুষও দুর্লভ ছিল না। ফলে সেই নপুংসক পুরুষের স্ত্রীও অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। একারণেই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে দূতী শ্রেণীর প্রভূত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

 এই প্রসঙ্গে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’ কাব্যে বড়াই চরিত্রের আলোচনা করতে পারি। তবে এখানে বড়াই কে কামশাস্ত্রের দূতী বা কুট্টিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না। কেননা এখানে বড়াই রাধার মায়ের পিসি। রাধার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বড়াইয়ের আবির্ভাব। কিন্তু তার পরেও লক্ষ্য করা যায় যে, বড়াই দূতীর ভূমিকা পালন করেছে প্রথমে কৃষ্ণের হয়ে শেষে রাধার হয়ে। কৃষ্ণকে রাধার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বড়াই কৃষ্ণকে দিয়ে অনেক কাজও করিয়ে নিয়েছে। সব থেকে বড় কথা বড়াই কৃষ্ণের রূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। দুজনের মিলন অনিবার্য এটা জেনেই বড়াই তাদের মিলিয়ে দিতে দূতীর কাজ করেছে। কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব স্বরূপ ফুল তাম্বূলাদি রাধার কাছে নিয়ে যায়। বড়াই রাধাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছে-

 “ যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী।।

 সে দেব সনে নেহা বাঢাইলে হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী।।”

 ‘দানখণ্ডে’ দেখা যায় বড়াইয়ের সহযোগিতায় কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলনের সুযোগ পায়। বড়াই রাধাকে নিয়ে বনের পথে বেরোয়। কৃষ্ণ রাধার পথ অবরোধ করলে তাতে বড়াই বাধা না দিয়ে বরং দুজনের মিলন সম্পূর্ণ করতে অন্য পথে সরে দাঁড়ায়। আবার ‘নৌকাখণ্ডের’ ঘটনা সম্পূর্ণ বড়াইয়ের পরিকল্পিত। বড়াইয়ের মধ্যস্থতায় এই খণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের মিলন হলে রাধা অপমানিত হয়। কিন্তু বড়াই ছাড়বার পাত্রী নয়, সে নানা কৌশলে রাধাকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা ছলাকলায় উৎসাহিত করতে থাকে। কিন্তু এবারে সমস্যা হল রাধার ইচ্ছা থাকলেও শাশুড়ির অনুমতি ছাড়া রাধা মথুরায় যেতে পারবে না। এবার রাধার শাশুড়ির কাছে কৌশলে বড়াই-

 “ তবেঁ তার থান গিয়া বুইল সত্ত্বরে।

 কি কারণে দুধি দুধ নঠ কর ঘরে।।

 হেনক কুমতী এঁ হয়িবেঁ ভিখারী।

 বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা নগরী।।

 হেনমতেঁ নানা পরকার করিআঁ।

 বুঢ়ি দিল রাধিকারে আনুমতী লআঁ”

 ‘ভারখণ্ড’ ও ‘ছত্রখণ্ডে’ দেখা যায় যে, বড়াই কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বহন করায় এবং রাধিকার মাথায় ছত্র ধরার কাজ করায়। কিন্তু যাকে পাঠিয়েছে কংসকে বধ করার জন্য সেই ভগবান কি করে এসব কাজ করতে পারে ? ছত্রখণ্ডে দেখা যায় ছত্র ধারনের কাজে কৃষ্ণের আপত্তি হবার আগেই বড়াই বলেছে-

 “তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি অনুমতি।

 হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী।।

 আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ।

 এহাত না করিহ কাহ্ন মনে কিছু লাজ।।

 ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে।

 কথো দূর গেলেঁ রতী পাইবেঁ জগ্ননাথে।। ”

‘বংশীখণ্ডে’ এসে রাধার ষোলশত সঙ্গিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর থেকে অনেকদিন রাধা কৃষ্ণের দেখা পায়নি। যে উদ্দেশ্য কৃষ্ণের আবির্ভাব সেই কংসকে বধ করার জন্য মথুরা গমনের প্রস্তুতি শুরু করেছিল তখন থেকে শুরু হয়েছিল রাধার বিরহ। এক্ষেত্রেও বড়াই চুপচাপ বসে থাকতে পারেনি। বড়াই একদিকে রাধাকে যেমন শান্তনা দেয় তেমনি আবার কৃষ্ণবিনে রাধার দুরাবস্থার কথা কৃষ্ণকে জানায়। একদিন বড়াই কৃষ্ণের হয়ে রাধার কাছে কৃষ্ণের ব্যকুলতার কথা জানিয়েছিল, আজ সেই বড়াই রাধার ব্যকুলতার কথা কৃষ্ণকে জানিয়ে বলেছে-

 “ আল তোর বিরহ দহ।

 দ্গধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে।। ”

শুধু তাই নয়, বড়াই করযোগে কৃষ্ণের কাছে কাতর কণ্ঠে মিনতি করে বলেছে সে যেন রাধকে ছেড়ে কখনো মথুরায় চলে না যায়। এখানে বড়াই শুধুমাত্র দূতীর কাজই করেনি, কাব্যটির মধ্যে নাটকীয় রস সৃষ্টিতে বড়াই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

 আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজির লেখা ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ কাব্যটিতে দুজন দূতীর পরিচয় পাওয়া যায়। দৌলত কাজির এই কাব্যটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে রাজা লোর ও রাজকন্যা চন্দ্রাণীর কথা, আর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে রাজা লোরের প্রথমা পত্নী সতী ময়নার বিরহ কথা। প্রথম খণ্ডের দূতী ধাত্রী এবং দ্বিতীয় খণ্ডের দূতী রত্নামালিনী। ধাত্রী প্রেমের এবং রত্নামালিনী কামের সংযোগ ঘটাতে মধ্যস্থতা করেছে। ধাত্রী দূতী হিসাবে লোর ও চন্দ্রাণীর মধ্যে চিরন্তন মিলনের চেষ্টা করেছে আর দূতী রত্নামালিনী সতীময়নার সঙ্গে পরপুরুষ ছাতনের কামের মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেছে। ধাত্রী আন্তরিক শ্রদ্ধা বশতঃ দূতীর কাজ করেছে, কিন্তু রত্নামালিনী ছাতনের কাছে কিছু পাওয়ার লোভে দূতীর কাজ করেছে।

 দৌলত কাজির ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’ কাব্যটি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম খণ্ডে রাজা লোর তার সুন্দরী পত্নী ময়নার সঙ্গে সুখ সম্ভোগে কিছুদিন কাটিয়ে পত্নীকে রেখে বসন্তকালে বনবিহারে বেড়িয়েছে। যখন কুঞ্জবনে সঙ্গীদের নিয়ে আমোদ প্রমোদে মত্ত তখন এক যোগীর মুখে চন্দ্রাণীর বর্ণনা শুনে। গোহারী দেশের রাজা মোহরার কন্যা চন্দ্রাণী যার বিবাহ হয়েছিল নপুংসক বামনের সঙ্গে। লোর চন্দ্রাণীর দর্শনে গোহারী দেশে গেলে দুজনকে দেখে দুজনের মধ্যে কাম ও প্রেম মিশ্রিত ভাব জন্ম নেয়। কেননা রাজা লোর নিত্য নতুন নারী সম্ভোগের প্রতি যেমন আকৃষ্ট হয় তেমনি আবার নপুংসক স্বামীর কাছ থেকে চন্দ্রাণী নিজের যৌবনের জ্বালা কখনো মেতাতে পারেনি। চন্দ্রাণী তার যৌবন লোরের কাছে সপে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন কোন মাধ্যমের। অতঃপর ধাত্রী নামের দূতীর আগমন হল যার সাহায্যে লোর ও চন্দ্রাণী একত্র মিলিত হতে পেরেছিল। চন্দ্রাণী লোরকে দেখে ব্যকুল হলেও লোর কতটা ব্যকুল চন্দ্রাণীর মনে সেই প্রশ্নটা জেগে উঠে। এই প্রশ্নের উত্তরে ধাত্রী চন্দ্রাণীকে বলেছে-

 “ প্রথম যৌবন বালা কলিকা বয়সী।

 হেমন্তের পুস্পের গন্ধ অঙ্গেত পরশি।।

 বিমল কমল দেহা গন্ধ ভরপুর।

 মঞ্জরী দেখিয়া লোভে আসিব ভ্রমর।।”

 রাজা লোর গোহারী রাজ্যে এলেও চন্দ্রাণী কোন মতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছে না। আবার লোরকে না দেখে চন্দ্রাণী থাকতেও পারছে না। এই সমস্যার সমাধান করতে দূতী ধাত্রী চন্দ্রাণীকে বলেন অন্তঃপুরে লোরকে নিমন্ত্রণ করতে। কেননা যদি লোরকে নিমন্ত্রণ করা যায় তাহলে দুজনের মিলন না হোক, কিন্তু চোখের দেখাটা হবে। ধাত্রী চন্দ্রাণীকে পরামর্শ দিয়ে শান্ত করতে গিয়ে-

 “ ধাঞি বোলে পুনি তুহ্মি কর নিমন্ত্রণ।

 সভাক বার্তিয়া আন যত রাজগন।।

 তখনে রচিব আহ্মি উপায় সন্ধান।

 তাহার তোহ্মার দৃষ্টি না দেখিব আন।।”

রাজা লোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলে সেখানে ঘটনাক্রমে দুজনের মনে প্রেম ও কাম জেগে উঠে। চন্দ্রাণী তার অতৃপ্ত বাসনাকে তৃপ্ত করতে চায় লোরকে লাভ করে। কেননা-

 “ লোর রূপ দেখি ধাঞি চিত্ত হৈল শান্ত।

 নয়ান আনন্দ হৈল দেখি কুল কান্ত।।

 মনেত চিন্তএ ধাঞি দর্শন কারণ।

 কোন মতে কুমারী দিবেক দরশন।।”

লোর ও চন্দ্রাণীকে কোথায় নিয়ে মিলিয়ে দেবে তা ভেবে অস্থির দূতী। কেননা দূতীর সাহায্য ব্যতিত এই মিলন কোন মতেই সম্ভব নয়। ধাত্রী প্রথমে লোরকে যোগী সাজিয়ে তার পর চন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে দুজনের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। এই সাক্ষাতের ফলেই দুজনের মধ্যে প্রবল কামভাব জেগে উঠে। রাতের অন্ধকারে চন্দ্রাণীর শয্যায় লোরকে আসার জন্য দূতী তাকে বলেছে-

 “ তোহ্মার অন্তরে দহে মদন গরলে।

 নিবারণ নহে মোর বৈদ্যশক্তি বলে।।

 ঔষধে নহে এ কামবিষ নিবারণ।

 কাম নির্বিষের মন্ত্র প্রিয়া দরশন।।”

দূতীর সাহায্যে লোর ও চন্দ্রাণীর মিলন চির মিলনের পরিণতি লাভ করল। উভয়ে উভয়ের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে গেল। চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোর রাজ্য ত্যাগ করলেও গোহারী রাজা পুত্রহীন বলে লোর ও চন্দ্রাণীকে ধরে এনে রাজ্যের রাজা করে দিল।

 দৌলত কাজির কাব্যের দ্বিতীয় আমরা খণ্ডে দূতী রত্নামালিনীর পরিচয় পাই যে কিনা রাজা লোরের অনুপস্থিতিতে ময়নার কাছে নিজেকে ধরিত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল। বিবাহের কিছুকাল পরেই স্বামীহীন ময়নার প্রতি নজর পড়ে দুষ্টু ছাতনের। ধীরে ধীরে ছাতনের মধ্যে ময়নাকে ভোগ করার বাসনা তীব্র হয়ে উঠলে রত্নামালিনীকে দূতী হিসাবে প্রেরণ করে ময়নার কাছে। ছাতনের লোভের শিকার হয়ে দূতী ময়নার কাছে গিয়ে কপট অভিনয় করে বলেছে-

 “ বুক মোর ফাটে ময়না তোর দুঃখ দেখি।

 পলকে পলকে যেন অগ্নি পোড়ে আঁখি।।

 জোয়ারের পানি যেন নারীর বয়স।

 যাবত না পড়ে ভাটি ভুঞ্জ রতিরস।। ”

ময়না সমস্ত কিছু ছেড়ে নিজের স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য নিয়মিত ব্রত পালন করে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে দূতী সারাক্ষণ ময়নাকে নানা কথায় ছলনা করার চেষ্টা করে। দূতী ভাগ্যের দোষ বলে ময়নাকে সব কিছু ভুলে যেতে বলে। ময়না যাতে আবার নতুন করে বাঁচতে পারে তার কথা উল্লেখ করে দূতী বলেছে-

 “ কোন দুঃখে সুখভোগ তেজ ময়নাবতী।

 আজিহ জনক তোর আছে ছত্রপতি।। ”

এখানে ছত্রপতি বলতে ছাতনের কথা বলেছে। কেননা যদি এই দুজনকে সম্ভোগে মিলিত করতে না পারে তাহলে ছাতনের কাছ থেকে দূতী কিছুই আদায় করতে পারবে না। এত চেষ্টা করেও যখন দূতী ময়নার স্বামী ভক্তিকে মন থেকে সরাতে পারছে না তখন বাধ্য হয়ে দূতী বারো মাসের নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করতে থাকে। আষাঢ় মাস প্রসঙ্গে দূতী ময়নাকে বলেছে-

 “ দেখ ময়নামতী প্রবেশ আষাঢ়

 চৌদিকে সাজে গম্ভীর।

 বধূজন প্রেম ভাবিয়া পন্থিক

 আইসয় নিজ মন্দির।।

 ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী

 পুরয় মনস্কাম

 দুর্লভ বরিষা তমসী রজনী

 নির্জন সঙ্কেত ঠাম।।”

উপায় না পেয়ে দূতী শেষ পর্যন্ত লোর ও চন্দ্রাণীর মিলন প্রসঙ্গ তুলেও ময়নার মন ভোলাতে সক্ষম হয়নি বরং শেষ পর্যন্ত ময়নার কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ছাতনের কাছে ফিরে যায়।

 অষ্টাদশ শতকে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে কবি ভারতচন্দ্র ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন। এই অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি কাব্যের মধ্যে তৃতীয় কাব্যটি হল ‘কালিকামঙ্গল’ বা ‘বিদ্যাসুন্দর’। এই বিদ্যাসুন্দর পালার মূল বিষয় হল বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন। এই বিদ্যা ও সুন্দরের মিলনের পিছনে দূতী হীরামালিনীর ভূমিকাও কিছু কম ছিল না। বিদ্যা সুন্দরের অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত দূতীর সহযোগিতায় সুন্দর রাতের অন্ধকারে বিদ্যার শয়নকক্ষে গিয়ে মিলন ক্রীড়া সম্পূর্ণ করেছিল। সুন্দরকে সাহায্য করার কথা রাজা জানতে পারলে দূতীর মাথা মুড়িয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা হলেও কুট্টিনী হীরা সামান্য কিছু ঘোষ দিয়ে নিরাপদে আশ্রয় লাভ করে। ‘বিদ্যাসুন্দর’ পালায় বিদ্যা ও সুন্দর প্রধান চরিত্র হলেও হীরামালিনীর মত জীবন্ত নয়। হীরার দূতীগিরি বিদ্যা ও সুন্দরকে সচল করে তুলেছিল।

 ভারতচন্দ্র এই কাব্যে হিরামালিনীর চরিত্র বর্ণনায় যে বিশেষত্ব দেখিয়েছেন পূর্ববর্তী কালিকা মঙ্গলের অন্য কোনো কবি এমনটা দেখাতে পারেননি। পূর্ববর্তী কবিরাও গতানুগতিকতা অনুসরণ করেই এগিয়েছেন। ভারতচন্দ্র হিরামালিনীর রূপ বর্ণনা করে বলেছিলেন-

 “কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।

 দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।।

 গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।

 কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে।।

 চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।

 ফুলের পাপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী।।

 আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।

 এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।।

 বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।

 পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়।।”

বিদ্যা নিজের মনের কথা শুধুমাত্র হীরাকেই বলতে পেরেছিল। কেননা হীরা জানত সুন্দরকে কিভাবে পাওয়া যেতে পারে। সুন্দরকে দেখে একবার হীরার চোখেও ধাঁধা লেগেছিল। যৌবন ফুরিয়ে গেলেও যেন মনের চাওয়া পাওয়া এখনও শেষ হয়নি। সুন্দরকে দেখে হীরা তার সমস্ত পরিচয় জানতে ব্যকুল হয়েছিল। হীরা সুন্দরকে বলেছিল-

 “হেরিয়া হেরিল চিত্ত বলে হরি হরি।

 কাহার বাছুনিরে নিছুনি লয়ে মরি।।

 কাছে আসে হাসে হাসে করয়ে জিজ্ঞাসা।

 কে তুমি কোথায় যাবে কোন্‌ খানে বাসা।। ”

এক সময় হীরাই আবার সুন্দরের প্রতি কুনজরে না তাকিয়ে বিদ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। শেষে শুধু বলা যায় হীরার জন্যই ভারতচন্দ্রের এই ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যটি অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্রতা লাভ করেছে।

 ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ বা ‘পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা’র কয়েকটি পালায় দূতীর প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে আমরা দুটি পালা- ‘মলুয়ার পালা’ ও ‘দেওয়ান ভাবনা’ পালায় দূতীর প্রভাব আলোচনা করতে পারি। মলুয়ার পালায় হিন্দু বিবাহিতা নারী মলুয়ার সঙ্গে মুসলমান পুরুষ কাজির কাম পিপাসার পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছিল নেতাই নামের এক দূতী। আবার দেওয়ান ভাবনা পালায় সল্লা নামের এক দূতী নায়িকা সুনাই ও নায়ক মাধবকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। দুটি পালাতে দুজন দূতী থাকলেও দুজনের কাজের উদ্দেশ্য আলাদা ছিল। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই দুটি পালায় দূতীর প্রভাব আলোচনা করা যাক।

 মলুয়ার পালায় মলুয়া ধনী পরিবারে কন্যা, কিন্তু ভাগ্যচক্রে তার বিবাহ হয় গরীব পাত্র বিনোদের সঙ্গে। বিনোদ গরীব হলেও সুখেই তাদের সংসার চলছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে এদের সংসারে অভাবের টান পড়লে বিনোদ স্ত্রীকে রেখে বিদেশে পাড়ি জমায় অর্থের সন্ধানে। বিনোদের অনুপস্থিতিতে মলুয়ার উপর নজর পড়ে কাজির। কাজি নেতাই কুট্টিনীকে সোনার লোভ দেখিয়ে মলুয়ার কাছে প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। যথারীতি নেতাই দূতী হয়ে মলুয়ার বাড়ি যায়। বিনোদের মাকে দেখে দূতী যেন আত্মার আত্মীয় হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে-

 “কি কর বিনোদের মা কি কর বসিয়া।

 অনেক দিন আইলাম বাড়িত তোমারে চাহিয়া।।

 শুনিয়াছি নয়া বউ আনিয়াছ ঘরে।

 এই মত সুন্দর নারী নাহিক সহরে।।

 চক্ষে নাই সে দেখি আমি কানে নাই সে শুনি।

 কিমত তোমার বউ দেখাও সেয়ানী।।”

এরপর দূতী প্রতিদিন যাতায়াত করতে থাকে বিনোদের বাড়িতে কিন্তু মলুয়াকে বলার মত সুযোগ দূতীর হয়ে উঠে না। নিত্য এরকম যাতায়াত করতে করতে একদিন নদীর ঘাটে মলুয়ার সঙ্গে দূতীর দেখা হয়ে যায়। এই সুযোগে দূতী কাজির মনের সমস্ত কথা মলুয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করে। দূতী প্রথমে মলুয়াকে ছলনা করার জন্য বলেছে-

 “তুমিত ঘরের বধূ অঙ্গ কাঞ্চা সোনা।

 রইয়া শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা।।

 বিচারে মালিক কাজী দেশের পরধান।

 কইবাম তার সকল কথা না করিবাম আন।।”

এই পর্যন্ত দূতীর কথা শুনেই তার আসল উদ্দেশ্য মলুয়া উপলব্ধি করতে পেরেছে। তখন দূতী আবার কাজির নানা গুনের প্রশংসা করে মলুয়াকে বলেছে-

 “তোমার রূপ দেখ্যা কাজী হইয়াছে ফানা।

 অঙ্গ ভরিয়া তোমায় দিব কাঞ্চা সোনা।।

 নিখা যদি কর তারে ভাল মত চাইয়া।

 তার ঘরের যত নারী রইব বান্দি হইয়া।।”

দূতীর এই সমস্ত কথায় মলুয়া নিজেও যেমন অপমানিত বোধ করেছে ঠিক তেমনি ভাবে অপমান করে সে দূতীকেও তাড়িয়ে দিয়েছে। দূতী এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই কাজিকে সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলেছে। এর ফলেই কাজি বিনোদের উপর পরোয়ানা জারি করল। মলুয়া যেখানে দুবেলা ভাত খেতে পায়না সেখানে এই পরোয়ানা মানে আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা। এ রকম দুঃসময়ে কাজি আবার দূতীকে মলুয়ার কাছে একই প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। দ্বিতীয়বার দূতী এসে মলুয়াকে বলেছে-

 “ফিরিয়া পাঠাইল কাজী তোমার দোয়ারে।

 মরজি করিয়া তুমি সাদি কর তারে।।

 ধান ভান সূতা কাট না সাজে তোমায়।

 অঙ্গে ছিঁড়া কাপড় শোভা নাহি পায়।।”

দূতী ও কাজি নানা কৌশল করেও যখন মলুয়াকে রাজি করাতে পারল না তখন কাজির লোকেরা এসে পরোয়ানা আদায়ের পরিবর্তে মলুয়াকে তুলে নিয়ে যায়। কাজির হাউলীতে তিন মাস থাকার পর মলুয়া বিনোদের কাছে ফিরে এলেও আত্মীয় স্বজনরা অসতী বলে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের জলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে।

 ‘দেওয়ান ভাবনা’য় দেখা যায় সুন্দরী কন্যা সুনাই অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়ে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে এসে আশ্রয় লাভ করেছে। মামা বামন হলেও বয়স্ক দেওয়ানের সঙ্গে সুনাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে যাতে সে দেওয়ানের কিছু সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে পারে। ইতি মধ্যে আবার নদীর ঘাটে নায়ক মাধবের সঙ্গে সুনাইয়ের সাক্ষাৎ হয়েছে। দেওয়ানের হাত থেকে রক্ষা পেতে সুনাই সল্লা দূতীকে বলেছে-

 “শুন শুন সল্লা দূতী কহিরে তোমারে।

 পত্র লইয়া যাও তুমি বন্ধুর গোচরে।।

 আজি সন্ধ্যাকালে দূতী মোরে লইয়া যায়।

 সন্ধ্যার তাঁরা নিব্যা গেলে না দেখি উপায়।।”

সুনাইয়ের এই দুঃসময়ে সল্লা দূতী তার পত্রখানি নিয়ে নায়ক মাধবের কাছে যায় এবং যথা সময়ে মাধব এসে সুনাইকে উদ্ধার করে নিজ গৃহে নিয়ে যায়। এই পালায় দূতীর কোন কথা প্রকাশ পায়নি, শুধুমাত্র সুনাইয়ের পত্রখানি মাধবের কাছে পৌঁছানো পর্যন্তই তার কাজ ছিল। দূতীর এইটুকু সাহায্যের ফলেই সুনাই তার মনের মানুষকে পেয়েছিল।

 সমগ্র আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মধ্যযুগে নর ও নারীর মিলনের পিছনে দূতী শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেই সময় নায়ক ও নায়িকারাই শুধুমাত্র দূতীর সাহায্য নিত না, অসৎ লোকও অসৎ কাজের জন্য দূতীকে ব্যবহার করত। আধুনিক কালের ডাক ব্যবস্থার মতই একটি সাহায্যকারী ব্যবস্থা ছিল দূতীর মধ্যস্থতা। সব সময় দূতী তার কার্যকলাপে সফল হতে না পারলেও ঘটনাবলীকে গতিশীল করে তুলতে সাহায্য করত। দূতী শ্রেণীর মধ্যে ভালো ও খারাপ কাজের মধ্যস্থতা থাকলেও তাদের উদ্দেশ্যে কখনো কটূক্তি করা উচিত নয়, বরং সেই সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতা করার জন্য আমাদের ধন্যবাদ তাদের প্রাপ্য।

গ্রন্থ সহায়কঃ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত(৩য় খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃলিঃ, ১৯৬৬

২। সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(২য় খণ্ড), আনন্দ প্রকাশনী, ১৯৪০

৩। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চন্দীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৬৬

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ(সম্পাদিত), দৌলত কাজির লোরচন্দাণী ও সতীময়না, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫

৫। ঘোষ, আশিস(সম্পাদিত), অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য, প্রজ্ঞা বিকাশ,২০০৮

৬। সেন, দীনেশচন্দ্র, পুর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৯

৭। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, এস কে এন্টার প

সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

 ‘বাস্তুভিটা’

আশিস রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

‘অঙ্ক শাস্ত্রে এক এক ধরণের Funcation (কৃত্য) বা equation (সমীকরণ) আছে যে গুলি সাধারণ ভাবে দ্রুত অথবা ধীর গতিতে বাড়তে বাড়তে অথবা কমতে কমতে হঠাৎ একটা বিন্দুতে এসে পড়ে যার সঙ্গে তার আগের বা পরের আকারের কোন সামঞ্জস্য নেই। একে আঙ্কিকরা singularity অথবা শূন্যবিন্দু বলেন। ১৯৪৭ সালের ভারতভাগ ইতিহাসের গতিতে সেরূপ শূন্যবিন্দু।’**১** ভারতবর্ষের মতো এই বিশাল ভূ-খণ্ডটি বিভাজিত হয়েছিল ‘দ্বি-জাতি’ তত্ত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির ফলস্বরূপ আজ ভারত – পাকিস্থান ও বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র তিনটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

 ১৯৪৭ সালে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন- ‘বাস্তুভিটা’ নাটক। এতে উদ্ঘাটিত হল খণ্ডিত দেশের বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবন-বেদনার ইতিহাস। ‘হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকুক- এই শুভবোধই নাটকের বিষয়বস্তু।’**২** কোন একটি দেশের সমস্ত মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল বা হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে না। কারণ তারা সকলেই পরিবার পরিজনে ঘিরে থাকে। দেশের সমস্ত মানুষ যদি হিংসায় উন্মাত্ত হয়ে ওঠে তবে সেই দেশের অস্তিত্ত্বের সংকট দেখা দেয়। যেমন কলকাতার দাঙ্গায় কলকাতার সমস্ত মানুষ সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে নি। কিংবা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। আসলে অশুভশক্তি এত তীব্র ভাবে মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে যে কখনও কখনও শুভবুদ্ধির সাময়িক পরাজয় ঘটে। ফলে শুভশক্তিকে আমরা লক্ষ করতে পারি না। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর ‘বাস্তুভিটা’ নাটকের মধ্যে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন। আসলে সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িকতাকে খর্ব করার কথা বলেছেন তিনি। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বকে দুই শত্রুর দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখাননি তিনি। আত্মাভিমানী দুই প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব হিসাবেই চিত্রিত করেছেন। তাই দেখা যায় দুর্দিনে, দুঃসময়ে সেইসব প্রতিবেশীরা পরস্পরের কাছে অনায়াসেই চলে আসতে পেরেছে।

 ‘বাস্তুভিটা’ নাট্য কাহিনি মোট ৭টি দৃশ্যে বিভাজিত, কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। মোট ১৩ টি চরিত্রের মধ্যে ১১টি পুরুষ চরিত্র এবং নারী চরিত্র ২টি। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাস্তুভিটা’ নাটক রচনার কারণ হিসাবে জানিয়েছেন- ‘স্বর্গীয় কবি ও সমালোচক শ্রী মোহিতলাল মজুমদার বঙ্গদর্শনের জন্য একটি নাটিকা লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।’**৩** আর এই কারণেই নাটক রচনা করতে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলেছেন- ‘১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট রাত্রি বারোটার সময় ছুটে গেলাম মানিকতলার চৌমাথায়। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা এল। সেদিন সাধারণ মানুষের মনে কি আনন্দের জোয়ার। মানিকতলায় লাল বাগান অঞ্চলে যে সব মুসলমান দাঙ্গার সময় রাজাবাজারে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা ছুটে এল মানিকতলায়। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে করল আলিঙ্গন। এই দৃশ্য একটা বিদ্যুৎ চমকের মতো আমাকে চমকিত করল। ভাবলাম এইটাই সত্য। রাজনৈতিক কারণে একটা দেশকে দুভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু একটা জাতিকে দু ভাগ করা যায় না। এই ঐতিহ্যকে তুলে ধরবার জন্যই এল আমার ‘বাস্তুভিটা’ নাটক।’**৪**

 বঙ্গভঙ্গের পর পাকিস্থানের হিন্দুদের দুর্দাশার চিত্র ‘বাস্তুভিটা’ নাটকে মহেন্দ্র মাষ্টারের পরিবারকে কেন্দ্র করে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। নাটকে দেখা যায় নন্দন গ্রামের মোড়ল প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সোনামোল্লার পুত্রদের অত্যাচারের ও কু-নজরের প্রতিকার করতে পারেননি মহেন্দ্র মাষ্টার। তবে তিনি স্ত্রী মানদার অনুরোধ সত্ত্বেও নিজেদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধ স্পৃহ ও হিঃস্র ইয়াসিন মিঞা ও তার দলবল গঞ্জ লুট করলে মহেন্দ্র মাষ্টার আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বুঝতে পারেন এদেশে আর মুসলমানদের পাশে থাকা যাবে না। শেষ পর্যন্ত ভিটে ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। আর তখনই শুভ বুদ্ধির জাগরণে সোনামোল্লা ও তার দলবল গ্রামের সকলের প্রিয় মহেন্দ্র মাষ্টারকে গ্রাম না ছাড়ার জন্য আনুরোধ করে।

 নাটকের মুখ্য চরিত্র মহেন্দ্র মাষ্টার। নাট্যকাহিনির শুরুতেও তিনি শেষেও তিনি। মুসলমানদের অত্যাচারে বিপন্ন হয়েছে তাঁরই পারিবারিক জীবন। পেশায় শিক্ষক হলেও দরিদ্র তিনি। একজন সৎ দরিদ্র মানুষ হিসেবেই তার পরিচয়। পিতা মাতার ভিটে ছেড়ে চলে আসার ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনটিই তার নেই। সর্বোপরি প্রতিবেশীর সঙ্গে এতদিনের সুসম্পর্কের উপর একধরনের আস্থা পোষণ করেন তিনি। ফলে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি- ‘পাকিস্থান হোক গোরস্থান হোক এখানেই আমাদের থাকতে হবে।’**৫** মানুষের ওপর তিনি বিশ্বাস হারাতে চান নি। কিন্তু ঘটনা ক্রমে ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। দরিদ্র স্কুল মাষ্টার সঙ্গত কারনেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। দেখা যায় স্থানীয় মানুষেরাও বিব্রত হয়ে পড়েছেন-

 কফিলদ্দি ।। মোল্লাসাব এইটা কি ভাল কতা অইল। গেরাম থেইকা সব যদি চইলা যায়, লোকে আমাগোই নিন্দা করব। কইব কাঞ্চনপুরের মিঞারা বড় পাজী, ইন্দোগো খ্যাদাইয়া দিছে।**৬**

 এখন প্রশ্ন হল ‘কাঞ্চনপুরের মিঞা’দের বদনাম হবে কাদের কাছে? অন্য গ্রামের মুসলমান বা হিন্দুদের কাছে? কিছু হোক বা না হোক মনুষ্য-সমাজে কলঙ্কের ছাপ লাগবে। এই ভেবে কফিলদ্দি বিচলিত হয়েছে। তার মহানুভবতার পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নাটকটি। অপর পক্ষে নাটকের অন্যতম চরিত্র কেরামত মানুষের সমস্যা বোঝে না, দুর্গত মানুষদের আরো দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিতে চায়। কেরামত বলে- ‘অত যাগো ডর তারা চইলা যাউক না।’৭ কিন্তু কেরামতের বুদ্ধি বিভ্রমের উত্তর দিয়েছে কফিলদ্দি- ‘বলি তোমার যদি আজ বাড়ি ছাইড়া চইলা যাইতে অইত- তোমার ক্যামন লাগতো?’**৮** এখানেই দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যে একটা দ্বি-মতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধেছে। যাকে কেন্দ্র করে এই বিষয়ের উপস্থাপনা সেই মহেন্দ্র মাষ্টার সমস্ত কিছু জেনেও নিজের জায়গায় অনড়। সু-সম্পর্ককে তিনি এই দুর্যোগের সময়েও ছিন্ন করেননি।

 আমীন মুন্সীর ছেলের শরীর খারাপ। আকাশে কালো মেঘ, প্রবল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা, তার ওপর অন্ধকার, এমন সময় একমাত্র ভরসা মহেন্দ্রমাষ্টার। কিন্তু স্ত্রী মানদা তাকে কিছুতেই যেতে দিতে চায় না আমীন মুন্সীর বাড়ি। কিন্তু স্ত্রীকে উপেক্ষা করে মহেন্দ্র মাষ্টার ঘরের বাইরে পা ফেলেছেন-

 মহেন্দ্র ।। ... আমীন মুন্সীর ছেলে মরে যাবে আর আমি এখানে বসে গোষ্ঠীর পিণ্ডি চট্টকাবো... যত্তো সব ... **৯**

 ‘তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও- আমি এই বাংলার পর রয়ে যাব।’ জীবনানন্দ তাঁর ‘রূপসী বাংলা’কে এই ভাবেই ভালোবেসেছেন। সমস্ত কিছু বিচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু বাংলা নয়। মহেন্দ্রবাবুও তেমনই প্রকৃতির সংস্পর্শকে ভুলে যাননি। জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা গাছপালা লতা গুল্ম এবং সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার বন্ধনে তিনি বাঁধা। মহানুভব মহেন্দ্র মাস্টারকে ঘিরে এক সম্প্রীতির বাতাবরণ কাঞ্চনপুরে গড়ে উঠেছে। যেখানে হিন্দু-মুসলিম এর মধ্যে আর ভেদাভেদ থাকে না। প্রবল সংকটের মধ্যেও মানুষকে তার শুভবুদ্ধি হারালে চলে না, তার মানবিক মুল্যবোধকে অটুট রাখতে হয় এমনই বার্তা দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর বাস্তুভিটা নাটকে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র –

১। অমিয়কুমার বাগচী, ভারত ভাগকে স্বাভাবিক পরিনতি বলা যায় কি, পুস্তক পরিচয়, আন্দবাজার পত্রিকা, ৯ আগষ্ট, ১৯৯৭।

২। সুস্নাত দাস, নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গণশক্তি ০৮।০৭।১৯৯০, পৃ-৩

৩। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস্তুভিটা, কলকাতা, পুস্তাকালয়, ১৯৪৭, স্মারক অংশ।

৪। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে।

৫। প্রাগুক্ত (সূত্র-৩, পৃষ্টা-২)

৬। প্রাগুক্ত (সূত্র-৩, পৃষ্টা-১৭)

৭। প্রাগুক্ত (সূত্র-৩, পৃষ্টা-১৮)

৮। প্রাগুক্ত (সূত্র-৩, পৃষ্টা-১৯)

৯। প্রাগুক্ত (সূত্র-৩, পৃষ্টা-৩৪)

কালবেলার অনিমেষ : অনিমেষের কালবেলা

 সঞ্জীবন মন্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

 ‘কালবেলা’ অর্থাৎ একটি বিশেষ সময় বা যুগ । এই বিশেষ সময় বা যুগের ইতিহাসকে উপন্যাসাকারে উপস্থাপন করতে গিয়ে সমরেশ মজুমদার আমাদের শুনিয়েছেন “এই সেদিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল আমাদের দেশে তাই নিয়ে কিছু লিখতে বসার সময় হয়েছে কিনা এই সংশয় থাকতেই পারে । সমসাময়িক কিছু নিয়ে লেখার মুস্কিল হল আমাদের দেখাটা অন্ধের হস্তি দর্শন হয়ে যায়”। সেই সঙ্গে তিনি আরও স্বীকার করেছেন “কালবেলা ভালবাসার উপন্যাস । দেশ মানুষ এবং নিজেকে। কারণ নিজেকে যে ভালবাসতে পারেনা সে কাউকে গ্রহণ করতে পারে না”।(গ্রন্থ ভূমিকা-কালবেলা)

 কালবেলা প্রকৃতপক্ষে ভালবাসারই উপন্যাস;এক উত্তপ্ত সময়ের দিকভ্রান্ত তরুণদের জীবন উচ্ছ্বাসের উপন্যাস;মাধবীলতার জীবনে ত্যাগ স্বীকারের উপন্যাস- সেই সঙ্গে নকশালপন্থী তরুণ অনিমেষ মিত্রের জীবন ট্র্যাজেডির উপন্যাস। নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল উপন্যাসিকেরা অনেকেই উপন্যাস রচনা করেছেন কিন্তু একটি যুগ,সময় বা ঘটনাকে তুলে ধরতে গিয়ে সমরেশ মজুমদার একই সঙ্গে সমগ্র পশিমবাংলাকে যে ভাবে একটি কাহিনীসূত্রের মাধ্যমে অঙ্কন করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রম বলেই আমরা মনে করতে পারি।

 কালবেলা উপন্যাসে অনিমেষ মিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার আগে উপন্যাসে বর্ণিত সময়কালকেও আমাদের কমবেশী জানা দরকার। আমরা জানি বিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশক ব্যাপী পশিমবাংলার আকাশে বাতাসে বইছিল এক প্রবল প্রতিবাদের ঝড়। যুবসমাজ হয়ে উঠে দিগভ্রান্ত। বেকারত্বের জ্বালায় মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরাও অস্থির হয়ে উঠে। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই কলকাতায় খাদ্য আন্দোলন,ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে ছাত্র আন্দোলন,শিক্ষক আন্দোলন প্রভৃতি ছিল নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনা। এই আন্দোলন গুলিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভিন্নভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন বা বিরোধীতা করে আন্দোলনকে প্রায় জঙ্গী আন্দোলনে পরিণত করে ছিলেন।

 অপরদিকে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়ে সিপিআই ও সিপিআই(এম) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ষাট ও সত্তরের দশকের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় সিপিআই রাশিয়াপন্থী কমিউনিজমে বিশ্বাসী হলেও সিপিআই (এম) মূলত চীনপন্থী কমিউনিজমের আদর্শে নিজেদের দিক্ষীত করে সংগ্রামের রুপরেখা অঙ্কন করেন। দুটি বামপন্থী দলই ভারতের কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতা করলেও জনসাধারণের মনে সিপিআই কংগ্রেসের দোসর হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। পশিমবঙ্গে এই সময় কালের মধ্যে চারবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারী হয় এবং প্রফুল্ল চন্দ্র সেন ১৯৬২ হতে ’৬৭ পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করলেও ’৬৭ এর পর থেকে ’৭২ সাল পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কোন মুখ্যমন্ত্রী সরকার পরিচালনা করতে পারেননি। অজয় মুখার্জী,প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রমূখ রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ যুক্ত ফ্রন্ট,প্রগতিশিল গণতান্ত্রিক জোট প্রভৃতি নামে একাধিক রাজনৈতিক দলের সহায়তায় বিচ্ছিন্নভাবে পশিমবাংলা শাসন করতে গিয়ে জনগনের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্বলনে ত্বরাণ্বিত করে তুলেন। ফলস্বরুপ বিভিন্ন আন্দোলন বিক্ষিপ্ত বা সংগঠিত ভাবে ঘটতে থাকে একাধিক রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় বা প্রচ্ছন্ন মদতে।

 এই উত্তপ্ত সময়ের মধ্য দিয়েই পশিমবাংলায় সিপিআই(এম) বামপন্থী সহ অন্যান্য দল গুলোর মধ্যে শক্তি,সদস্য ও জনগনের সমর্থনের দিক থেকে দ্রুত অনেকটাই এগিয়ে যায় । বৃহত্তর বামপন্থী দল; বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজ;তাই নিজেদের মধ্যে কলহ লাগাটাই স্বাভাবিক। নেতৃত্বের প্রতি চরম অসন্তোষ জানিয়ে এক দল সিপিআই (এম) ত্যাগ করে বা বিতাড়িত হয়ে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা মাও সে তুঙ এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁরা জনসমর্থনও পেলেন বেশ। ভারতের বুকে অতীতের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যত আন্দোলনের সফলতাকেই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। তেভাগা আন্দোলন,তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন,সিধু কানুর নেতৃত্বে গঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহকে তাঁরা অতীতের সফলতম আন্দোলন মনে করে সেই আন্দোলন গুলোয় স্বতস্ফুর্ত মানুষের অংশ গ্রহণ ও তাঁদের ত্যাগ স্বীকারের কথা জনগনের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাও সে তুঙ এর আদর্শকে ভারতের জনগনের মধ্যে বিস্তারের জন্য জঙ্গী কার্যকলাপ করতেও তাঁরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক এই উত্তপ্ত মুহুর্তেই অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে,বামপন্থী সমর্থনপুষ্ট যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে উত্তরবাংলার দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি ব্লকে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। স্বাধীন ভারতে এবং বামফ্রন্ট সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে কৃষক পরিবারের এগারোটি প্রাণ লুটিয়ে পড়েন জোতদারী প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সন্মিলিত আক্রমণে একজন পুলিশ অফিসারও নিহত হন। নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানে উৎসাহিত হয়ে বিতাড়িত বা বিপ্লবের স্বপ্নে নিমগ্ন কমিউনিস্টরা নকশালবাড়ি আন্দোলনকে ব্যাপক ভাবে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেন এবং নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থনকারীরা দেশবাসীর কাছে নকশাল বা নকশালপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। একটি জায়গার নামে একটি সংগঠিত বা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী পরিচিত হয়ে উঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নকশালিসম বা নকশালপন্থী শব্দটি ‘দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা’য় প্রথম ব্যবহার হয় বলে আমরা জানতে পারি।

 যাইহোক,কালবেলা উপন্যাসের প্রধান-অপ্রধান চরিত্র ও ঘটনা ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা উপরিউক্ত সময় বা যুগকে উপলব্ধি করতে পারি। উপন্যাসিক সমসাময়িক কালের দেখাকে ‘অন্ধের হস্তি দর্শন’ এর সঙ্গে তুলনা করলেও তিনিই সেই ঘটনাধারাকে নিয়ে কালবেলার মতো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসকেন্দ্রীক রাজনৈতিক উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। যে উপন্যাসের নায়িকা মাধবীলতার নাম প্রায় সকল সাহিত্য প্রেমীদের জানা। মাধবীলতা ও অনিমেষের অমর প্রেমের জুড়িও বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। উপন্যাসটির জন্য লেখক ১৯৮৪ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভ করেন এবং ২০০৯ সালে একই নামে গৌতম ঘোষের পরিচালনায় বাংলা সিনেমা নির্মিত হয়।

 ডুয়ার্সের স্বর্গছেঁড়া চা বাগান থেকে কলকাতা কলেজে পড়তে এসেছিলেন অনিমেষ মিত্র। স্কটিশ চার্চে তিন বছর পড়াশুনা করলেও কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না,কিন্তু সেই অনিমেষ মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়াকালীন রাজনীতিই হয়ে উঠে তাঁর মুখ্য ধ্যান জ্ঞান। অবশ্য তিনি প্রথম কলকাতা শহরে পা রেখেই দেখতে পেয়েছিলেন-দাউ দাউ করে রাজপথে ট্রাম জ্বলছে ; কেন জ্বলছে ? কারা জ্বালাচ্ছে ? লোকজন কেন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে-এসব কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার পায়ের থাই বিদ্ধ হয়ে যায় পুলিশের বন্দুকের গুলিতে। হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে আসার পর সুবাস সেনের সঙ্গে কথা বলে অনিমেষ জানতে পারেন-সুবাস সেনরাই সেদিন তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন এবং কলকাতার রাজপথ জুড়ে তারাই বিপ্লবী আন্দোলনের সৈনিক। সুবাস সেনের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি তিনি একজন বামপন্থী সক্রিয় কর্মী। পশিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের তৎকালীন শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই হাসপাতালে দাঁড়িয়েই অনিমেষকে বলেছেন ‘ভারতবর্ষের হাসপাতাল গুলোর সঙ্গে মর্গের কোন পার্থক্য নেই’(পৃঃ ২৮)।

 এরপর কেটে গেছে পাঁচবছর। অনিমেষ মিত্র স্কটিশ চার্চ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেছেন। মফঃস্বলের ছেলে,দাদু সরিৎশেখরের কথা মতো বিশ্ববদ্যালয়েও তিনি ছাত্র রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে পাঁচবছর আগের পরিচিত সুবাস সেনের সংস্পর্শে এসেই তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কথা প্রসঙ্গে সুবাস সেন অনিমেষবাবুকে জানিয়েছেন ‘আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে তৈরী হয়েছে যাতে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়’(পৃঃ৪২)।

 বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সুবাস সেনের মাধ্যমে বামপন্থী ছাত্র নেতা সুদীপ-বিমানদের হাত ধরে অনিমেষ সক্রিয় রাজনীতিতে আসতে বাধ্য হন। কারণ হঠাৎ করেই একদিন সুদীপ বিমানরা ছাত্রছাত্রীদের জমায়েত করে অনিমেষকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং পাঁচবছর আগের কংগ্রেস সরকারের পুলিশ অন্যায় ভাবে অনিমেষের থাই এ যেভাবে গুলি করে তাকে প্রায় পঙ্গু করে রেখেছেন সেই কাহিনি ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে পরোক্ষে ভোটভিক্ষা করেন। নিজের মনের সায় না থাকা সত্ত্বেও অনিমেষ সংগঠনে জড়িয়ে যান রাজনীতির সাত-পাঁচ না বুঝেই। অপর দিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রাতারাতি হোস্টেলের ছাত্রদের কাছে তিনি জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিলেন।

 আমরা দেখলাম, উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন লাজুক ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আকস্মিকভাবেই জনপ্রিয় ও পরিচিত হয়ে উঠলেন মূলত ২টি কারনে-

 ১। অতর্কিতে এবং অন্যায় ভাবে পুলিশ অনিমেষকে গুলি করেছিল-যে ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী মহলে প্রচারিতও হয়েছিল ভুলভাবে। সাধারণ ভাবেই অনিমেষের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ পেতে থাকে এবং তার মধ্যে ভবিষ্যৎকালের মহান বিপ্লবীর ছায়া অনেকেই দেখতে পান।

 ২) হোস্টেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের ঘরে অবৈধভাবে মহিলা প্রবেশকে কেন্দ্র করে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, পুরো ব্যাপারটা তিনি দ্রুত সমাধান করে হোস্টেলে নায়কের আসন পেয়েছিলেন। তাই ত্রিদিব নামে হোস্টেলের একজন বর্ডার জানিয়েছেন-‘এ ঘটনা কাল অন্য ছেলেরা জানবে। অটোমেটিক্যালি তুমি হীরো হয়ে যাবে। নেক্সট স্টেপ ইউনিভার্সিটির ইলেকশনে জেতা; তারপর ইউনিয়নের সেক্রেটারী,তারপর এম এল এ মন্ত্রী। স্বর্গের সিঁড়ি-উঠে যাও’(পৃঃ ১১০)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রফেডারশনের নেতা বিমান হোস্টেলের খবর শুনে প্রতিবাদী অনিমেষকে জানিয়েছেন-‘হতাশ হয়ো না কমরেড ,প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তুমি যা করেছ তা অনেক,কিন্তু এ থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষিত হলে বেশী লাভবান হবে’(পৃঃ১১২)।

 অনিচ্ছতা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদ নির্বাচনে অনিমেষ মিত্র প্রতিদ্বন্ধিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন। কিন্তু সংসদ ও সংগঠনের কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারেননি। তাঁর বার বার মনে হয়েছে ‘এই দেশে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না’। অন্যদিকে ডানপন্থী অর্থাৎ কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন নির্বাচনে পরাজিত হলে সংগঠনের সাধারণ সমর্থক ও নেতারা কেমন নির্লিপ্ত হয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে-এই সুবিধাবাদী রাজনীতির তিনি কোন অর্থ খুঁজে পাননি। যে প্রসঙ্গে অনিমেষের মনের অনুভূতি সমরেশ মজুমদার আমাদের শুনিয়েছেন- ‘দল হেরে গেলেই যে এমন করে পিছিয়ে যেতে হয় অনিমেষ জানত না,এখন জানল’। কমিউনিস্ট আদর্শে পরিচালিত হলেও সিপিআই এবং সিপিআই(এম) কেন ভিন্ন মতাদর্শীতে বিশ্বাসী এই জটিল মনস্তত্ব অনিমেষের বোধগম্য হয়নি। চীন ভারত যুদ্ধের প্রভাবে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি কেন দ্বিখন্ডিত হল সে সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক জ্ঞান তাঁর ছিলনা। তাই এস এফ(রাইট) সমর্থকরা অনিমেষদের অর্থাৎ এস এফ (লেফট) সমর্থকদের চীনের দালাল বলে শ্লোগান দিলে অনিমেষ এর কারণ ও ব্যাখ্যা খুঁজে পান নি।

 একদিকে পড়াশুনা,অন্যদিকে রাজনীতি। পড়াশুনা বলতে বাংলায় এম এ ডিগ্রি নিয়ে ভবিষ্যতে আদৌ কিছু করা যাবে কিনা সেই অনিশ্চয়তার মেঘ তাঁর মনের কোণে মাঝে মাঝে উঁকি দেয়-আবার বামপন্থী রাজনীতির জটিল তত্ত্বও তাঁকে গভীরভাবে ভাবায়-‘মাও সে তুঙ,চে গুয়েভারা,লেনিন কিংবা হোচিমিন যা করেছেন সে গুলো কি সব ক্ষেত্রে ত্রুটি হীন’। এই দুটানা জীবনে উন্মেষ ঘটে মাধবীলতা মুখার্জীর। যে মাধবীলতার সঙ্গে তাঁর ‘ কোনও দিনও কথা হয়নি। শুধু চোখে চোখে সে মেয়েটি সম্পর্কে যে কল্পনা তৈরী করেছিল তার সঙ্গে বাস্তবে কোনও মিল নেই। মেয়েটি এত সিরিয়াস,এত স্পষ্ট কথা বলতে পারে এবং কী নির্লিপ্ত হয়ে নিজেকে আড়ালে রেখে দিয়েছে তা কি ওই চোখ দেখে আন্দাজ করা যায়’(পৃঃ১২১)। এই মাধবীলতার সঙ্গে প্রথম যেদিন অনিমেষের কথা হয় মাধবীলতা জানতে চেয়েছিলেন- ‘আচ্ছা সত্যি কি আপনি নিজেকে কমিউনিস্ট ভাবতে পারেন’। প্রতুত্তরে অনিমেষ জানিয়েছেন- ‘কমিউনিস্ট ? আমি ঠিক জানি না। তবে আমি এমন সমাজ ব্যবস্থা চাই যেখানে কোনও বৈষম্য থাকবে না’(পৃঃ১২৯)।

 ত্রিকোণ দ্বন্ধের জটিল আবর্তে অনিমেষ নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। রাজনীতিতে প্রবেশের পর থেকেই পড়াশুনা হতে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন; তার উপর বাংলা সাহিত্যে এম এ পাশ করে ভবিষ্যতে কাজের ক্ষেত্রটাও সীমাবদ্ধ। আশাহত ও বেদনাহত অনিমেষ ভবিষ্যতে আর্থিক প্রতিকূলতার দুশ্চিন্তার ঘোরে নিজের অজান্তেই বিরবির করেন-‘হয়তো বাবার নির্দেশ মেনে বাংলার বদলে অর্থকরী বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করলে আজ এসব ভাবতে হতনা’। মাধবীলতাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনিমেষ দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে মিলিয়ে যান। কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে মাধবীলতাকে ভালবেসে তিনি কি তাকে স্ত্রীর উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলতে পারবেন নাকি সারাটাজীবন মাধবীলতার উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হবে। কাউকে পেতে হলে তার যোগ্য হওয়ার তত্ত্বে অনিমেষ মাধবীলতার সামনে নিজের কোন যোগ্যতাকেই দাঁড় করাতে পারেননি। তাই মাধবীলতার প্রতি তাঁর একটা হীনমন্নতা ছিলই,কিন্তু মাধবীলতা স্কুলে চাকরী করলেও কর্মহীন ও বিপ্লবী অনিমেষকে দূরে সরিয়ে দেননি বরং অনিমেষকে ভালবেসেই নিজের পরিবারের মায়াকে বিসর্জন দিয়েছেন।

 বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নেতা,মাতৃহারা অনিমেষ মিত্রকে সুবাস সেন ভবিষ্যৎ দেশ ব্রতীর স্বপ্ন দেখালেও সংগঠনের ছোট বড় মাঝারি মাপের পরিচিত নেতাদের স্বার্থলোলুপ ও খামখেয়ালি মনোভাবে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। নির্বাচিত সদস্যদের সাথে কোনরকম আলোচনা ছাড়াই সংগঠনই প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং সেই সিদ্ধান্ত মতোই সংসদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা হয়। যেখানে অনিমেষদের মুখ বুজে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। সুবাস সেনের মুখ হতে অনিমেষ যেদিন জানতে পারেন- ‘প্রতিবাদ করার জন্যে আমাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে’ ; হতবাক ও বিস্ময়ে তিনি কথা বলতে পারেননি -শুধু মনের অজান্তেই কতগুলো কথা ঘূর্ণাবর্ত হয়েছে তাঁর মন জুড়ে -‘যে এত গুলো বছর দলের জন্য প্রাণপাত করে গেল’ তাকে পার্টি কি করে বহিস্কার করে ? এতে পার্টির সুবিধাভোগী ও তোষামোদকারী কমরেডদের চলার পথ সুগম হলেও সামগ্রীক ভাবে পার্টিরই তো ক্ষতি। ভ্রান্ত নেতৃত্বের প্রতি তাঁর মনে বিষোদগারের সৃষ্টি হলেও অনিমেষ প্রতিবাদ করতে পারেননি;প্রকাশ্যে সুবাস সেনকে সমর্থনও করতে পারেননি। ছাত্র নেতা বিমানের বক্তব্যের প্রতিবিম্ব তাঁকে বিদ্ধ করে-‘যারা পথভ্রষ্ট তারা কখনই এগোতে পারে না’। তবে কি সুবাস সেন পথভ্রষ্ট;যে সুবাস সেন তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন,যাঁর হাত ধরে অনিমেষ রাজনীতিতে নাম লিখিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সুবাস সেনকে সমর্থন করলে অনিমেষও কি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন-এই কল্পনার ফাঁকেই অনিমেষের মনে মাধবীলতার পূর্বকথা বিক্ষিপ্তাকারে ভেসে উঠে- ‘লতা বড় জড়িয়ে ধরে,বিরক্তি আসবে নাতো কখনও’।

 পার্টির প্রতি অনিমেষের মনের পারদ যখন ক্রমশই নিন্মগামী,সেই সময় দলের নির্দেশে তাঁকে উত্তরবঙ্গে যেতে হয় একটি উপনির্বাচনে পার্টির প্রচারে। দিনাজপুর জেলার দাসপাড়া নামক অঞ্চলে উপনির্বাচনে সিপিআই(এম) প্রার্থীর হয়ে জনসাধারনের সঙ্গে কথা বলে তিনি শুধু হতাশই হননি-সেই সঙ্গে বামপন্থী ও কংগ্রেসিদের ভোট প্রচারের সঙ্গে কোন তফাৎ খুঁজে না পেয়ে পার্টিকে না জানিয়ে জলপাইগুড়িতে দাদু সরিৎশেখরের কাছে চলে যান। মাধবীলতা অনিমেষের কাছে অনুরোধ করেছিলেন ‘তুমি আমাকে কখনও অবহেলা কোরোনা’। অনিমেষবাবু মাধবীলতার এই আবেদন তাঁর হৃদয়ে পোষণ করে রাখলেও পার্টির প্রতি অবহেলা করে কিন্তু পরোক্ষভাবে মাধবীলতার প্রতিই অবহেলা করেছেন বলে আমরা মনে করতে পারি । উত্তরবঙ্গে উপনির্বাচনে পার্টির প্রচারপর্বের পুরোটাই তাঁর কাছে ছলচাতুরী বলে মনে হয়েছে। কেননা ‘কমিউনিজমে যারা বিশ্বাস করে তারা কেন জনসাধারনের কাছে ভোট ভিক্ষে করবে? কমিউনিস্টরা যদি তাদের আচার আচরণ কাজ কর্মে ওই মতবাদকে জনসাধারণের সামনে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরতে পারে তাহলে নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষ যতই প্রচার করুক না কেন মানুষ নিজের প্রয়োজনেই কমিউনিস্টদের ভোট দিতে আসবে। তা সম্ভব হচ্ছে না কারণ এদেশের কমিউনিস্টরা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি’(পৃঃ২১২)। ‘অধিকারবোধ বড় অন্ধকার করে দেয় মানুষ কে’-যে অধিকারবোধ নিয়ে পার্টির কাজকে পেছনের সারিতে রেখে অনিমেষ সরিৎশেখর বাবুর কাছে উঠেছিলেন সেই অধিকারবোধেই সরিৎশেখর বাবু অনিমেষকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ‘অর্থ কষ্ট বড় কষ্ট অনিমেষ’-বলে সরিৎশেখরবাবু একদিন আক্ষেপ করেছিলেন কলকাতায়,সেই অভিমানি সরিৎশেখরবাবু জলপাইগুড়িতে নিজ বাসভবনে বিছানায় শুয়ে জানিয়েছেন ‘অনিমেষ আত্মহত্যা করতে পারবনা,কিন্তু দীর্ঘজীবন বেঁচে থাকার মতো পাপ আর কিছু নেই’(পৃঃ২০৪)। অনিমেষ পারেননি দাদুকে অর্থকরী দিয়ে সাহায্য করতে;দাদু তাঁকে যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্যও তিস্তার স্রোতে ভেসে যাওয়ার উপক্রম। রাজনীতি থেকেও তিনি প্রায় ছিটকে গেছেন-শেষ সম্বল বলতে মাধবীলতা।

 জলপাইগুড়ি হতে অনিমেষ স্বর্গছেঁড়ায় দুদণ্ড শান্তির জন্য ছোটমায়ের কাছে এলে এই প্রত্যন্ত চা বাগানেও বামপন্থী দল গুলোর পোস্টার পতাকা দেখে যেমন বিমোহিত হয়ে যান তেমনি এর সুফল কুফল প্রভৃতি বিষয়েও চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর বাল্য কালের সাথীরাও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে কোনকিছু না জেনে না বুঝে শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে লেনিনের ছবি টাঙিয়ে সমাজতন্ত্রের জয়গান গাইছেন। ছোটবেলার খেলার সাথী বিশুর সঙ্গে পার্টি বিষয়ে কথোপকথনে অনিমেষ উপলব্ধি করেছেন-সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়েই সংগ্রামের নামে পার্টির আড়ালে সুবিধবাদী লোকে ভরে গেছে। তাই সুযোগসন্ধানী বিশুও অনিমেষকে বলেন- ‘আমরা পাঁক তুলব আর নেতারা চাটনী খাবেন? এদেশের মানুষ কখনই কমিউনিস্ট হবে না। তারা যেই নিজের স্বার্থে ঘা পড়বে তখনই কমিউনিজমকে বাতিল করবে। এইরকম ঠুকঠাক করতে করতে যতটুকু এগোনো যায় ততটুকুই ভাল’(পৃঃ২১৩)।

 অনিমেষ উত্তরবঙ্গ হতে কলকাতায় ফিরে এলে ছাত্র নেতা সুদীপ-বিমানদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ আরও চরমপর্যায়ে চলে যায়। সংগঠনের সঙ্গে সমস্তরকম সংস্রব ত্যাগ করার পরিকল্পনাও করেন কিন্তু পরক্ষণেই সুবাস সেনের দূর্গতির কথা মনে পড়ে যায়। মাধবীলতাকে অনিমেষ একান্তে জানিয়েছেন ‘আসলে আমি এই দলের কাজকর্ম মানতে পারছিনা। এরা যেভাবে চলছে সেভাবে চললে এদেশে কোনও দিনই কমিউনিজম আসবে না। বুঝে সুঝে অন্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগছে না’(পৃঃ২২৪)। তাঁর মনে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্ম ঘট ডেকে,হরতাল করে কমিউনিজম আসবে না। ‘এই দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে হলে সশস্ত্র যুদ্ধ চাই’(পৃঃ২২২)। ভবিষ্যৎ দেশে বৃহত্তর সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা তার মস্তিস্কে ঘোরা ফেরা করলেও তিনি উপযুক্ত পরিবেবশ বা বিপ্লবীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক সেই সময় আশ্রয় প্রার্থী সুবাস সেনকে নিজ হোস্টেলে আশ্রয় দিয়ে অনিমেষ ছাত্রজীবনকে ত্যাগ করে,সুবিধাবাদী রাজনীতিকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে ‘রিভোলিউশনারি মার্ক্সবাদী’ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাতে বদ্ধপরিকর হন। অনিমেষকে সুবাস সেন জানিয়েছেন-‘এক সময় আমি ডেডিকেটেড ছিলাম;কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে একমুখী ছিলাম।...................আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চীনের পথে সম্ভব। আমরা সেটা অর্জন করতে চাই। এই মেরুদন্ডহীন মানুষগুলো কিন্তু আমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবে না। আমাদের আদায় করতে হবে। আমরা মনে করি বন্দুকের নলই হল মানুষের প্রকৃত শক্তির উত্স। অনিমেষ আমরা একটা আগুন জ্বালাতে চাই। যে আগুনে আমাদের নকল চামড়ার খোলস পুড়ে ছাই হয়ে যাবে; একটা নতুন ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়াবে শ্রেণীহীন সমাজব্যাবস্থা নিয়ে’(পৃঃ২৩৯)। সুবাস সেনের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এবং উপযুক্ত বিপ্লবী সাথীকে খুব কাছে পেয়েই অনিমেষ বিশ্ববিদ্যালয়ে এস এফ (লেফট) নেতা সুদীপকে বলেছেন-‘আমার মনের সঙ্গে আপনাদের কাজকর্ম মিলছে না। যে পথটাকে সমর্থন করতে পারছি না সে পথে হাঁটতে আমার বিবেকে বাঁধে’(পৃঃ২৪৩)।

 স্বেচ্ছায় সংগঠন ত্যাগ করে অনিমেষ কিছু দিনের মধ্যেই সুবাস সেনের মাধ্যমে মহাদেব সেনের সঙ্গে উত্তরকলকাতার সিঁথি এলাকায় এক গোপন আলোচনা সভায় মিলিত হন এবং সেই সভায় মহাদেব সেনের মুখ থেকেই আগামী দিনের কর্মধারায় ব্যাপক উৎসাহিত হন।‘মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত বা বেরিয়ে আসা নেতারাই চীনের অনুসরণে সারা ভারতবর্ষে একটি অগ্নিবিপ্লবের সূচনা করতে চান’(২৬৫)। এই প্রতিবাদী বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের অতীত বিপ্লবকে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরিকল্পনা করেন। কেননা অতীতে দেখা গেছে সিধু কানুর নেতৃত্বে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষে,সেখানে খেটে খাওয়া কৃষক মজুর শ্রেণীই মূল ভূমিকায় ছিলেন। আবার তেভাগা আন্দোলন ছিল মূলত কৃষকদেরই আন্দোলন। তেলেঙানার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল শোষিত বঞ্চিত অবহেলিত জনগনের দ্বারাই। মহাদেব সেন সকলের সামনে গোপনীয়তা বজায় রেখে ঘোষণা করেন-‘আমাদের প্রধান কর্তব্য হল গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে হবে’। মহাদেব সেনের কথা মতোই তাঁরা ‘অলইন্ডিয়া কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ কমিউনিস্ট রেভলিউশনিরিজ’ নামে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কলকাতা সহ পশ্চিমবাংলার শহরগুলোর দেওয়াল জুড়ে শ্লোগান লিখতে থাকেন ‘ চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, বন্দুকের নল শক্তির উৎস,মাও সে তুঙ সূর্যের চেয়ে বড় কারণ তাঁর চিন্তাধারা পৃথিবীর সর্বত্র আলো দেয়’। শুরু হয়ে যায় মুক্তির সংগ্রাম। ষাট ও সত্তরের দশক হয়ে উঠে এক শ্রেণীর লোকের কাছে মুক্তির দশক।

 নতুন সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েই অনিমেষ উত্তরবঙ্গে যান। কারণ অনিমেষের পক্ষে কলকাতা আর নিরাপদ ছিলনা। শিলিগুড়ির বারীন সরকারের সহায়তায় এবং জুলিয়েন ও সিরিল নামক দুইজন আদিবাসী যুবকের মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। বোলপুরে পৌষমেলা উপলক্ষ্যে বিপ্লবী নেতৃত্বরা গোপনে সভাও করেন এবং আগামীদিনের একটা রুপরেখা তৈরী করেন। এখানেই মাধবীলতার সঙ্গে অনিমেষ স্বামী স্ত্রীর মতো ক্ষণ মুহুর্ত মেলামেশার সুযোগ পান। অনিমেষের আত্মরক্ষার্থে সুবাস সেন তাঁকে কাগজে মুড়ে একটি পিস্তল দিলে মাধবীলতা সেই পিস্তলকে নিরাপদে রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করে অনিমেষের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমকে পাঠকের সামনে আরও জীবন্ত ভাবে তুলে ধরেন। ভবিষ্যতের সুখ সমৃদ্ধির আশা না করে শাসক আইন ও সমাজের চোখকে উপেক্ষা করে এক জন সমাজ বিপ্লবীকে ভালবেসে মাধবীলতা শুধু সংগ্রামী দশকের একজন নারী হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেননি-সংগ্রামকে ত্বরাণ্বিত করার কারিগর হিসেবেও নিজের জীবনকে অনিমেষের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একজন অগ্রণী সৈনিক হিসেবে বিলিয়ে দিয়েছেন। অনিমেষের অনিশ্চ্য়তাময় জীবনেও যেভাবে তিনি অনিমেষকে কখনো লতার বাঁধনে আবদ্ধ করেছেন আবার কখনো বাঁধন খুলে দিয়ে মুক্তাঙ্গনে স্বতস্ফুর্ত ভাবে কাজ করার,সমাজের শোষিত বঞ্চিত অবহেলিতদের হয়ে সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে দিয়েছেন তাতে মাধবীলতা শুধু একজন নারী নন তিনি হয়ে উঠেছেন বিদূষী রমণী। বোলপুরের মেলায় হাঁটতে হাঁটতে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য স্বামী স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়েই মাধবীলতা অনিমেষকে জানিয়েছেন-‘তুমি যতই মুখে বিপ্লবের কথা বলো,দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন চাও,আসলে ভেতরে ভেতরে তুমি খুব রোম্যান্টিক’। প্রত্যুত্তরে অনিমেষ জানিয়েছেন-‘যা কিছু সচল তাইতো বিপ্লবের অবলম্বন। জড়পদার্থ কখনও বিপ্লব করতে পারে না। প্রকৃত বিপ্লবী যে সে কিন্তু মনে মনে ভীষণ রোম্যান্টিক। চে গুয়েভারা কিংবা মাও সে তুঙ তো কাঠখোট্টা লোক ছিলেন না’(পৃঃ৩২৬)।

 যাইহোক,বোলপুরে অনিমেষদের একত্রিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল আগামী দিনের আন্দোলনের প্রসারে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে একত্রিকরণ সংক্রান্ত আলোচনা এবং সেই সঙ্গে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিপ্লবকে ত্বরাণ্বিত করা। রাতের অন্ধকারে অনিমেষদের সভার পরেই সুবাস সেন একজন গুপ্তচরকে হত্যা করেন। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম ধাপ তাঁরা পার হয়ে যান। পশ্চিমবাংলার বিশৃঙ্খলাময় অবস্থার মধ্যেই ১৯৬৭ তে নকশালবাড়িতে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত বা ত্যাগী গোষ্ঠী অর্থাৎ সুবাস সেন অনিমেষ মিত্ররা নকশাল বাড়ী আন্দোলনকে ব্যাপক ভাবে সমর্থন করেন। তাই অনিমেষ বাবু পানিরাম নামক একজন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিকে হত্যা এবং তার বাড়ি লুঠ করে বাড়ির দেওয়ালে লিখে দেন-‘নকশালবাড়ি লাল সেলাম’ ‘গরীব মানুষের শত্রু পানিরামরা সাবধান’ এবং তাঁরা এই বলে শপথ নেন যে ‘যতদিন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস না হচ্ছে ততদিন আমরা বিশ্রাম করবনা’। নকশালবাড়ির প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নকশালবাড়ি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েই ‘রেভলিউশন কমিউনিস্ট’রা সকলের কাছে নকশাল হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন। অর্থাৎ একটি জায়গার নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন পরিচিত হয়ে ওঠে।

 আন্দোলন খুব বেশীদিন টিকেনি,যা রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট নেতা বারিন সরকারের মুখ হতেই জানা যায়-‘ অনিমেষ এখন পার্টির মধ্যে হু হু করে বেনোজল ঢুকছে। গুন্ডামি করার এমন সুযোগ ক’জনে ছাড়ে। ঝাড়াই বাছাই করার সুযোগ আর নেই। আমার খুব ভয় করছে অনিমেষ’(পৃঃ৩৬০)। অচিরেই নকশালপন্থীদের মধ্যে ২টি ভাগ হয়ে যায়-খতমপন্থী এবং বিরোধী। উত্তরবঙ্গে কাজ করতে করতেই ডুয়ার্সের এক প্রত্যন্ত রেলস্টেশনে পুলিশের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধে মহাদেব সেন পালাতে ব্যর্থ হলেও অনিমেষ গুরুতর আহত হন এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অনিমেষ মিত্র জেলে থাকাকালীন অবস্থাতেই নকশালবাড়ি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। উপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন-‘ভারতবর্ষে এই আন্দোলন চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যাঁরা গলা কাটা আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের পুলিশ হয় হত্যা করেছে নয় করছে। আর যাঁরা এ তত্বে বিশ্বাসী নন তাঁদের বিভিন্ন জেলে ছুঁড়ে ফেলছে’(পৃঃ৩৮৭)।

 একটি বিশেষ যুগকেন্দ্রীক বা ঘটনাকেন্দ্রীক উপন্যাস হিসেবে ‘কালবেলা’বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে,মাধবীলতার ত্যাগ সেই যুগের বাস্তবতার ঐতিহ্যকে সমগ্র পাঠকের সামনে জীবন্তভাবে তুলে ধরবে। কেননা নকশালবাড়ির ইতিহাসে দেখা যায় মাধবীলতা,অনিমেষ মিত্র,সুবাস সেনদের মতো অনেক বিপ্লবীই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবনকে হাসিমুখে উৎসর্গ করেছেন অকথ্য অত্যাচার ও জ্বালাযন্ত্রনাকে সহ্য করে। সমরেশ মজুমদার সেই দিন গুলির ঘটনাসমূহ উপস্থাপন করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ‘কালবেলা’ উপহার দিয়ে। কিন্তু উপন্যাসটি আরও বাস্তবসম্মত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত যদি তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিকেও কমবেশী উপন্যাসে তুলে ধরতেন। কেননা উপন্যাসটি যেহেতু নকশালকেন্দ্রীক;নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাতও উত্তরবঙ্গে । আন্দোলনের প্রথম সারির সিংহভাগ নেতৃত্বও ছিলেন উত্তরবঙ্গের। নকশাল সমসাময়িক ও পরবর্তী ঘটনাধারায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর ছাত্রছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে আমরা জানতে পারি। ‘রেভলিউশনারী কমিউনিশট’এর চিন্তা ধারা কলকাতায় সৃষ্টি হলেও নকশালবাড়ির ঘটনা ঘটেছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই;রেভলিউশনারী কমিউনিস্টরা শুধুমাত্র এই আন্দোলনকে সর্বাঙ্গীন ভাবে সমর্থন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কে রেখে ঔপন্যাসিক যদি উপন্যাসের কাহিনীধারাকে অন্তিমপর্যায়ে নিয়ে যেতেন তবে হয়তো ‘কালবেলা’ হয়ে উঠত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। সুবাস সেন,অনিমেষ মিত্র,মাধবীলতাদের মধ্য দিয়ে সমরেশ মজুমদার ষাট ও সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রীক রুপকে তুলে ধরতে গিয়ে ইতিহাসকে ব্যাপক ভাবে বিকৃত করেছেন, তাই ‘কালবেলা’ঐতিহাসিক উপন্যাস না হয়ে ইতিহাস আশ্রিত রাজনৈতিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। অপর দিকে অনিমেষ মিত্রকে একাধিক ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক চরিত্রের ছত্রছায়ায় সৃষ্টি করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নকশাল আন্দোলনের রূপরেখা উপন্যাসাকারে তুলে ধরতে গিয়ে নায়ক চরিত্রকে পাঠকের সামনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে তুলে ধরতে পারেননি। তাই ছাত্র ও ছাত্র নেতা অনিমেষের জন্য পাঠকের মনে যতটা উদ্রেকের সৃষ্টি হয়,নকশাল অনিমেষের জন্য কিন্তু ততটা উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়না,বা তাঁর হঠকারিতাপূর্ণ কিছু কাজকর্মও পাঠকের মনঃপুত হয়না বলে আমরা বলতে পারি। যাইহোক ‘কালবেলা’ অর্থে আমরা একটি কালের সঙ্কটময় পরিস্থিতিকে যেমন দেখতে পেয়েছি ; তেমনি সেই সংকটময় পরিস্থিতিকে এগিয়ে নেওয়ার বা বাস্তবায়িত করার জন্য অনেকের ব্যক্তিগত জীবনের ‘কালবেলা’কেও আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি উপন্যাসে। তাই কমিউনিস্ট মহাদেব সেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন;মাধবীলতা স্বামীকে দেখতে গিয়ে পুলিশের হাতে নির্মমভাবে অপদস্ত হয়েছেন,সমাজের চোখে কলঙ্কিত হয়েছেন;অনিমেষ মিত্র উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবন ত্যাগ করে, পুলিশের হাতে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে, মাধবীলতার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়েছেন।

 তথ্যসূত্র -

১) কালবেলা,সমরেশ মজুমদার,সপ্তবিংশ মূদ্রণ- ১৪১৭,আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা

২)অর্ধেক জীবন,সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,ষষ্ঠ মূদ্রন-২০১০,আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা

৩)তেভাগা আন্দোলন, ধনঞ্জয় রায়(সম্পাদনা) তৃতীয় মূদ্রণ-২০১০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৪)ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথা সাহিত্য,অরূপ কুমার দাস, প্রথম প্রকাশ- ২০১২,করুণা প্রকাশনী,কলকাতা

৫)বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি,নাজমা জেসমিন চৌধুরী,দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ-২০০৯,চিরায়ত প্রকাশন,কলকাতা

৬)বাংলা উপন্যাসে যুবসমাজ, ঊর্মি রায়চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ-২০০১,পুস্তক বিপনী,কলকাতা

৭)ষাটের ছাত্র আন্দোলন,শৈবাল মিত্র,দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৯৭,আজকাল,কলকাতা

৮)বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,পঞ্চম সংস্করণ-২০০৩,দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা

৯)কালের প্রতিমা,অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়,পঞ্চম সংস্করণ-২০১০,দে’জ পাবলিশার্স,কলকাতা

১০) ‘মাওবাদ’ মতাদর্শের অবক্ষয় রাজনীতির অধঃপতন,নীলোৎপল বসু,দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১০ এন বি এ,কলকাতা

১১)নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে,আজিজুল হক,দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০২,দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা।

***শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ও সমকালীন বাঙালী সমাজ***

নির্মল বন্ধু দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ-বাংলার ইতিহাসে অস্থির এক পর্ব । সেটা আমাদের দেশে ভোগবাদ ও জড়বাদের যুগ। একদিকে ভোগবাদ ও জড়বাদের তান্ডব নৃত্য, অন্যদিকে অন্তঃসার শূন্য বাঙালী সমাজের নির্বিকার পথচলা। ইংরেজী শিক্ষার অন্ধ মোহে এদেশের শিক্ষিত সমাজ সনাতন ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ, একটা হীনমন্যতা তাদের সর্বদেহে মনে। মূর্তিপূজা তাদের কাছে পৌত্তলিকতার নামান্তর, বর্ণাশ্রম প্রথা তাদের কাছে একটি অতীত স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস।

এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঊনিশ-বিশ' গ্রন্থে বলেছেন- ''রামমোহনের বেদান্ত-উপনিষৎ-অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, বিচার-বিতর্ক, ব্রাহ্মণেতর সমাজের হাতে অশূদ্রপরিগ্রাহী শাস্ত্রগ্রন্থের আবির্ভাব, হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভুরিভোজ, সাময়িক পত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গলদের যেকোন ধর্মবোধ ও পারমার্থিকতার বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার-এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে মনে হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড় যুবকদের চাপে এবং পাশ্চাত্যের ইহমুখী ও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে বাঙালীর দীর্ঘকাল লালিত ধর্মবোধ বুঝি লুপ্ত হয়ে গেল।'' পৃ-২২৩

অহঙ্কার, জাত্যভিমান, ভিন্ন ধর্মালম্বীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে সমাজজীবন আচ্ছন্ন । সুস্থ নীতিবোধ ও কল্যাণের আদর্শ সমাজজীবনে অনুপস্থ। শাসক বিদেশি, বিধর্মী-হিন্দুধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ। ধর্মান্তরকরণে প্রবল চেষ্টা। হিন্দুর ধর্মান্তর রোধ করার তেমন কোন সুসংহত সমাজ চেতনা ছিলনা । বহু লোক নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার ফলে ধর্মান্তরিত হয়েছে। সর্বত্র হিংসার পৈশাচিক নৃত্যের যুগে জনজীবন যখন বেদনার্ত তখন প্রেমপ্রীতির সঞ্জীবনী সুধার অক্ষয় ভান্ড নিয়ে প্রভু বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাব।

এ প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু জীবনীকার শ্রীমৎ গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারীজির উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য- ''উদার উপনিষদের মানব ধর্ম, অত্যুদার মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম পুঁথিতে আছে, কাহারও জীবনে বা আচরণে নাই। মানুষকে মানুষ বলিবার সৌজন্যটুকুও মানুষ হারাইয়া বসিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম সহস্র ভেদের গন্ডী রচনা করিয়া মানুষকে মানুষের পাওনাটুকু দিতে নারাজ। বৈষ্ণব ধর্ম শুষ্ক আচারের অত্যাচারে, সাম্প্রদায়িকতায়, সংকীর্ণতায়, আউল-বাউল সাঁই-দরবেশ, কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজা প্রভৃতির চাপে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। সহস্রাধিক বাগদী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবে, এই সংবাদে হিন্দু সমাজের কেহ একবিন্দু বিচলিত হইল না। বাতব্যাধিগ্রস্ত অসাড় সমাজ-দেহে কোথাও একটু বেদনার অনুভূতি জাগিল না। সমস্ত দেশের মধ্যে কেবল একজনের দরদী প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ফরিদপুর সহরতলী ব্রাহ্মণকান্দা পল্লীর নবীন তপস্বী, নবগৌর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর ।'' -ব, লী, ত ১/১২১ পৃ

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবির্ভাবকালে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বাংলার সমাজ-জীবন নানা অন্ধ কুসংস্কারের সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ ছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের জাতপাতের ঘৃণ্য নাগপাশে পিষ্ট হয়ে চন্ডাল, বুনো বাগদী, কোল-ভীল প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা ধুঁকে ধুঁকে মনুষ্যত্বের অধিকার বঞ্চিত জীবন যাপন করছিল। একদিকে হিন্দু সনাতন ধর্মের নিষ্ঠুর ক্রিয়া কলাপ, অন্যদিকে ব্রাহ্মণাদির উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের নানা অমানুষিক অত্যাচার ও দৌদন্ড প্রতাপ সমাজ দেহে যে দুরারোগ্য কর্কট রোগের সৃষ্টি করেছিল, তা বাংলা তথা ভারতের আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। এরূপ ভয়াবহ দুঃসহ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে হাজার হাজার অত্যাচারিত যন্ত্রণা-কাতর অন্তেবাসী মানুষ দলে দলে খ্রীষ্টান ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাচ্ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসক দ্বারা শাসিত হিন্দু সমাজে হিন্দুত্বের শূন্যগর্ব অহঙ্কার ছাড়া হিন্দুয়ানী প্রায় লুপ্ত হতে চলেছিল । তখন হিন্দু সমাজের উপর ছিল তৎকালীন নব্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের প্রবল আক্রমণ । খ্রীষ্টান মিশনারী ও ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে হিন্দু কলেজের বহু শিক্ষিত যুবক তখন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং প্রচার করে যে, হিন্দু ধর্ম একটি মানবিকতাহীন, পৌত্তলিকতা মাত্র। সেখানে মানুষের মর্যাদা নেই । আছে শুধু একের প্রতি অন্যের অন্ধ বিদ্বেষ।

''হিন্দুর ধরমে নাহি ঔদার্যের লেশ ।

সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি লয়ে করে সদা দ্বেষ ।।'' ব, লী, সু ১/১৪৯ পৃ

অতএব এদেশের আত্মার উন্নতির জন্যে যদি কোন সত্য ধর্ম থাকে তা হল খ্রীষ্টান ধর্ম। তাছাড়া ভগবৎ জ্ঞানহীন, পান্ডিত্যমনা ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ-সাধন ভজন মানবিকতা পরিহার করে নিছক ইন্দ্রিয়ের প্রবল ভোগ-লালসায় মত্ত হয়ে বাহ্যিক জাঁক-জমক, পরনিন্দা-পরচর্চা ও পারস্পারিক কলহে কালাতিপাত করছিল। সমাজের পাপ-পঙ্কিল গলি ছিল অধিকাংশ মানুষের কাঙ্ক্ষিত বিচরণ ক্ষেত্র ।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের সমকালীন বাংলার ফরিদপুর ও কলকাতার যে আলেখ্য-চিত্র জগদ্বন্ধু-জীবনীকার শ্রীমৎ গোপীবন্ধু ব্রহ্মচারী তাঁর ''শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী'' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও পঞ্চম খন্ডে চিত্রিত করেছেন, তা থেকে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরিদপুর শহরে বাস করত প্রায় সাড়ে সাত হাজার লোক, তারা সমাজে বুনো বাগদী নামে পরিচিত । তাদের পুর্বপুরুষেরা নীল চাষ করত । নীল চাষ উঠে যাওয়ায় তারা বেকার হয়ে পড়ে। তাই তারা মাটি কাটত, ধান কাটত, লাঠি খেলাও জানত এমনকি বাবুদের মধ্যে দ্বন্দ লাগলে তারা লাঠিয়াল হিসাবে মারামারিও করত। বাগদীদের কোন ধর্মের বন্ধন নেই, সামাজিক আচার-বিচারের বন্ধন নেই, তবুও তাদের মনে বিশ্বাসের বন্ধন আছে। তারা হিন্দু দেবদেবীকে ভক্তি করে, গোব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করে অভ্যাস বশতঃ প্রণাম করে ঠাকুর দেবতাকে । কিন্তু হিন্দু সমাজ তাদেরকে মানুষের অধিকারটুকু দেয় না !

হিন্দু সমাজে তারা ছিল অস্পৃশ্যদেরও অস্পৃশ্য, অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত । সেই সময় উচ্চবর্ণের অত্যাচার চোখে পড়ার মত । উচ্চবর্ণের মানুষ তাদের বুনো বলে ঘৃণা করত, অশুচি বলে লাঞ্ছনা দিত, তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে দ্বিধাবোধ করত। তাদের রাজকার্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, এমনকি মাথা তুলে স্বাধীন মানুষের মত পথ চলার অধিকার পর্যন্তও ছিল না । এই রকম পরিবেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সামাজিক সাম্যের প্রলোভন এবং শ্রেণীগত সংস্কারের অনুপস্থিতি বুনো বাগদীদের নতুন করে বাঁচার পথ দেখাল।

সেই সময় রাজধর্ম ছিল খ্রীষ্টান মিশনারীদের অনুকূলে । চারিদিকে চলছিল ইংরেজী স্কুল গড়া, গীর্জা প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় লোকদের আত্মার উন্নতির নামে ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা। লেখাপড়া, জামাকাপড়, ঔষধ পথ্য, চাকরি বাকরি সবই সহজলভ্য ছিল তাদের আশ্রয়ে গেলে। ফলে গীর্জা মুখো হলো সাধারণ মানুষ । বিশেষ করে বুনো বাগদী, ডোম প্রভৃতি অবজ্ঞাত জনেরা।

বুনোদের সর্দারের নাম ছিল রজনী বাগদী। হিন্দু সমাজের পর্বত সমান অপমান, উপেক্ষা ও লাঞ্ছনা রজনীর মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। আরও মনে পড়ে রজনীর এক করুণ কাহিনী। সে এক বেদানাময় ইতিহাস। বাবুদের বাড়ীতে শারদীয় দুর্গা ঊৎসব। বাবুদের আদেশ, যে করেই হোক মায়ের পূজার বেল পাতা সংগ্রহ করতেই হবে, কিন্তু বেল পাতা কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা। কারণ প্রবল ঝড়ে সমস্ত বেল পাতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার সত্ত্বেও রজনী শতশত কাঁটার আঘাত সহ্য করেও মায়ের পূজার বেলপাতা এনে দিয়েছিল। রজনী পাতা রেখে মায়ের মূর্তি দর্শন করছিল। এমন সময় রান্নাঘর থেকে মন্দিরে মায়ের ভোগ গেল, তৎক্ষণাৎ ভট্টাচার্যি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ''সামিয়ানার তলে বুনো দাঁড়াইয়া আছে, তোরা ভোগ নিলি কী করিয়া? সব ফেলে দে'' রজনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, হতভাগা ! সামিয়ানার নিচে দাঁড়ালি কোন সাহসে? রজনীর সঙ্গে আরও দু'-তিন জন ছিল । ভট্টাচার্যি তখন লাঠি দিয়ে রজনীকে তাড়া করল । যাবার সময় রজনী শুধু বলে গেল ''ঐ কোণায় যে কুকুরটি আছে সেটাকে তাড়ালেন না ?

এতদিন এসব সে মুখ বুজে সহ্য করেছে, কিন্তু আজ তার মন বিদ্রোহ করে বসল । না আর নয়। তার দলের শ্রীমন্ত, সত্য, মহিম অনেকদিন থেকেই খ্রীষ্টান হওয়ার সংকল্প করে আসছে এতদিন সে নানা কথা বলে তাদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে, আজ ঠেকাবে কি দিয়ে ? রজনীর মনের মধ্যে গাঢ় রজনী । গভীর নিশিতে রজনী ভাবে, কিভাবে ত্যাগ করব এই ধর্ম ও পিতামহের চিরায়ত বিশ্বাস। অবশেষে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্ধের অবসান ঘটিয়ে স্থির করে খ্রীষ্টান হওয়ার দিন।

 এদিকে এই মর্মঘাতী সংবাদ পৌঁছিল প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের কাছে । সংবাদ পেয়ে বন্ধুসুন্দর দুঃখীরামকে বললেন-দুঃখী! তুমি এখনই গিয়ে রজনীকে বল, আমি তাকে ডেকেছি । দুঃখীরামের মুখে 'প্রভু ডেকেছেন' এই সংবাদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে রজনী ছুটছে ব্রাহ্মণকান্দা অভিমুখে। আর ভাবছে পূর্বদিনের চৌদ্দমাদল নগর কীর্তনের মাঝখানে দাঁড়ানো রূপের মানুষটির কথা, যার অপ্রাকৃত রূপমাধুরী সেদিন সমগ্র বুনো জাতিকে মুগ্ধ করেছিল। রজনী গিয়ে দেখে প্রভু দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন । যেন কার অপেক্ষায়, চেহরায় যেন বহুকালের পুঞ্জীবিত বেদনার ছাপ। রজনীকে দেখা মাত্র প্রভু বললেন, রজনী এসেছ ! রজনী এসেছ! বলে আলিঙ্গন দিলেন। প্রভুর অপার্থিব আলিঙ্গনে রজনীর সমস্ত আক্ষেপ, অভিমান মুহূর্তের মধ্যেই ভাব গঙ্গার তোড়ে যেন ভেসে গেল।

প্রভু বললেন, রজনী ! তুমি হিন্দু ধর্ম ছেড়ে খৃষ্টান হবে কেন? রজনী বলল, প্রভু কি করব আমরা যে হীন-পতিত। এ সমাজে আমাদের স্থান কোথায় ? প্রভু তখন আদর ভরা কন্ঠে বলে উঠলেন, কে বলেছে তোমরা হীন-পতিত, আরে মানুষ কি কখনও পতিত হয় ? তোমরা হীন নও, তোমরা মহান। হরিনাম করলে তোমরা আরও মহান হবে। তোমরা বুনো জাতি নও। তোমরা মানব জাতি। তোমরা আমার অতি প্রিয়। শ্রীহরির দাস তোমরা, এটাই তোমাদের আসল পরিচয় । রজনী, তুমি সেই নিত্যকালের পরিচয়ে পরিচিত হও। আজ থেকে তুমি আর রজনী নও। তুমি হরিদাস, প্রাণভরে নিতাই গৌরের জয় গাও । তোমার সম্প্রদায়ের নাম হবে মোহন্ত সম্প্রদায় । আগামী পরশু তোমরা সকলে আসবে, এখানে প্রসাদ পাবে, কীর্তন করবে। আমি তোমার সঙ্গে খাব, আমার ভক্তরা তোমাদের আপন করে নিবে।

''করুণাঁখি মেলি কহে বন্ধুহরি শুনগো রজনী আমার কথা ।

কৃষ্ণদাস তুমি এই পরিচয় কৃষ্ণসেবা ধর্ম নহে অন্যতা ।।

গৌরনিত্যানন্দ চরণে শরণ লইলে ডুবিবে ব্রজের রসে ।

কীর্তন সাধন আমি শিখাইব আমি বসি খাব তোমার পাশে ।।''

-বন্ধুলীলা মাধুরী ২/১৪৬-৪৭

নিদিষ্ট দিনে পাদ্রীরা তৈয়ার হয়ে আসল, তাদের খৃষ্টান করার জন্য । রজনীর সঙ্গে প্রতিবেশী সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলল, তোমরা ফিরে যাও, আমরা খৃষ্টান হব না । আমরা জগদ্বন্ধুর দাস হব''। পাদ্রীরা ভগ্নমনোরথ নিয়ে গীর্জায় গিয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, ''যা আমরা পাঁচবছরেও করতে পারিনি, তা ব্রাহ্মণকান্দার জগৎ সাধু পাঁচ মিনিটে করেছে !''

''করুণা প্লাবনে দুর্গত বুনোরা দুর্গত বুনোরা ডুবিল ভাসিল প্রেম ধারায়।

মোহন্ত হইয়া মন্ডলী সৃজিয়া কীর্ত্তনে বর্ষণে ধরা মাতায়।।'' বন্ধুলীলা মাধুরী ১/৬

জগাই মাধাইকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ পতিতোদ্ধারণ লীলার অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। জগাই মাধাই ব্রাহ্মণ কুমার, নগরের কোতোয়াল-নিতান্ত অশিক্ষিতও ছিলেন না। প্রভু জগদ্বন্ধু যাদের উদ্ধার করলেন তারা বর্ণে গোত্রে হীনতম, ক-অক্ষর জ্ঞানহীন, এবং যারা ছিল সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত । প্রভু উদ্ধার করলেন একটি দু'টি ব্যক্তিকে নয়, সম্পূর্ণ একটি সম্প্রদায়কে। জীবদেহে নিত্যানন্দের বাস-এই কথাটি প্রভু শুধু মুখে বলেন নি, যেরূপভাবে নিজের জীবনে দেখিয়েছেন সেভাবে আর কেউ কোনদিন দেখান নি । বুনো বাগদীদের ভালবেসে তাদের দেবতা করে তাদের হাতের রান্না ভোগ গ্রহণ করেছেন। শুধু ভালবাসেন নি কোলে তুলে আদর করে অন্তরে ঈশ্বর ভাবনা জাগিয়ে তাদের দেবত্ব দান করেছিলেন । -এরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পতিত উদ্ধারণ লীলায় শাস্ত্রের-

''চন্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ ।

হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ ।। ''

 -পাদ্মেএই বাণী সার্থকরূপ লাভ করেছে।

এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজি তাঁর 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী'' গ্রন্থে বলেছেন- ''প্রভু বন্ধু সুন্দরের কৃপার বাতাসে মোহন্ত সম্প্রদায়ের যে রূপান্তর ও ভাবান্তর হইল এবং তদ্দর্শনে অভিজাত সমাজের যে দিব্যদৃষ্টি ফুটিল, তাহা বর্ণনা করিলে প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কে বিশ্বাস করিবে? যাহারা শূকর মারিত, শূকরের মাংস কাঁচা পোড়াইয়া খাইত, তাহারা গোপীচন্দন তিলক কন্ঠী ভূষিত হইয়া সাত্ত্বিক আহার বিহারে জয় গান করিতেছে ।'' পৃ-১২৫

 সমগ্র বুনা জাতির এই আশ্চর্য পরিবর্তনের কথা সেদিন ১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসের ''ভারতবর্ষ'' পত্রিকায় 'জগদ্বন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্যিক রসিকলাল রায় লিখেছিলেন- ''যে সকল কোল, সাঁওতাল, কুলি রাস্তা বাঁধিতে আসিয়া যশোহর-ফরিদপুরে বসবাস করিতেছে তাহারা ও তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ স্থানীয় লোকের নিকট 'বুনা' নামে পরিচিত। বুনাবাড়ী অশ্লীল নাচ, গান, ব্যভিচার ও সুরাপানের জন্য বিখ্যাত ছিল। হঠাৎ একদিন সাধক জগদ্বন্ধু ঘৃণিত বুনাদের বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। সে ব্রহ্মচর্যের অদ্ভূত তেজে তাহারা বিস্মিত হইল, সে অপরূপ মোহন মূর্তি দেখিয়া তাহাদের সরল প্রাণ মোহিত হইল । ফরিদপুরের অনাচারী বুনা শুদ্ধাচারী হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিল।'' শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু শতজয়ন্তী স্মরণিকা, পৃ-১৭১

শুধু বুনো বাগদীরা নয়, সেকালের রামবাগানের অবজ্ঞাত ডোম ও সোনাগাছির পতিতারাও প্রভু বন্ধু সুন্দরের পবিত্র কৃপার পরশে মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছিল ।

রামবাগান ছিল বর্তমান কলকাতার চিৎপুর ও বিডন স্ট্রীটের পাশে । সেই সময়ে স্থানটি ছিল, নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত। সেখানে ছিল এমন একটা অশালীন পরিবেশ, যা শিষ্ট রুচিকে আঘাত, এবং মনকে পীড়িত করত। রাস্তাঘাট অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন । ঘন ঘন বস্তি। খুপরি খুপরি খোলার ঘর। রাস্তায় ধুলিমাখা ধরণীর অসহায় সন্তানের মত নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছেলের দল। পুরুষদের অবস্থাও শোচনীয়। তাদের কেউ কেউ বেতের ঝুড়ি তৈরি করত, কেউ কেউ দিনের বেলাতেই মাতলামি করত। মেয়েদের পরনে ছিল আধময়লা শাড়ি। গৃহস্থালির পাশে পাশে তারা তৈরি করত বাঁশের চুপড়ি, ডালা কুলা ও এ জাতীয় জিনিস। চারিদিকে নগরীর কর্ম কোলা- হল, কিন্তু এ পাড়ায় ছিল শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের শরমের ডালি।

এ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ তাঁর 'হীন পতিতের ভগবান' গ্রন্থে বলেছেন- ''এখানে সভ্যতার আলো প্রবেশ করে না, কখনো ঘটে না সভ্য ভব্য সমাজের পদচারণা, সাধু সন্ত মহাজন থাকেন এ পাড়ার বাইরে। কারণ এর অধিবাসীরা অশিক্ষিত, বন্য, জাতিতে এরা ডোম-এরাই হলো আধুনিক স্মৃতি শাসিত সমাজের ভাষায় প্রকৃত ব্রাত্যজন ।'' পৃ-৩৫

সভ্যতার আলো বঞ্চিত এই ব্রাত্যজনদের মধ্যে সেদিন এসেছিল উচ্চ বর্ণীয় এক ব্রাহ্মণ, যাঁর নাম জগদ্বন্ধু। শুধু যে এসেছিলেন তা নয়, শক্ত বাঁশের ছাঁটার উপর রাত্রিও যাপন করেছিলেন। একটি মাত্র উদ্দেশ্য তা হলো হীন পতিতদের পাতিত্য দূর করে ব্রজের নির্মল শুদ্ধ ভালবাসায় উজ্জীবিত করা, করেছিলেনও তাই। তাঁর আগমনটিও ছিল আলোক উজ্জ্ব। সেদিন প্রভু বন্ধু সুন্দর এসেছিলেন চাষাধোপাপাড়ার হরকুমার রায়ের বাড়ি থেকে রামবাগান তিনকড়ির বাড়িতে। বাইরের দৃষ্টিতে এই দুই বাড়ির দূরত্ব অতি সামান্য, কয়েক মিনিটে আসা যায়। কিন্তু সামাজিক ব্যবধানের কথা ভাবলে তা দুর্লঙ্ঘ্য । কারণ জুয়েলার হরকুমার সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি। তাঁর ঘরে রাজসেবা। আর ডোমরা সমাজের পতিত, দারিদ্র্য-পীড়িত, সর্বহারা কাঙাল। তা-সত্ত্বেও সমস্ত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে প্রভু বন্ধু এসেছিলেন দারিদ্রলাঞ্ছিত ছোটদের কাছে। সাধারণত ছোটরা ভিড় জমায় বড়র কাছে, আনন্দ লাভের আশায়। কিন্তু আজ ঘটেছে তার ব্যতিক্রম, যিনি বড় তিনি এসেছেন, ছোটদের দুয়ারে, গৌরপ্রীতি দানের প্রত্যাশায় ।

''কলিকাতা আসি চাষাধোপাপাড়া শ্রীহরকুমার বাসায় স্থিতি।

রামবাগানের পতিত অধম ডোম জাতি প্রতি অশেষ প্রীতি ।।

মদ ছাড়াইয়া হীনতা ঘুচাইয়া গৌরনাম রসে মাতালে সব ।

জয় গৌর জয় জগদ্বন্ধু হরি রামবাগান ভরি উঠিল রব ।।''- বন্ধুলীলা মাধুরী ২/১৮৯

সেদিন প্রভু বন্ধু সুন্দরের দর্শন-স্পর্শন ও উপদেশে তারা হল পূত পবিত্র দ্বিজ । এ প্রসঙ্গে নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁর ''Sri Sri Prabhu Jagadbandhu''গ্রন্থে বলেছেন- ''Even the followers of chaitanya, though professing his faith had neither the courage nor the mind to take even Maha prasad sanctified with offering to lord sri Gouranga, not even a glass of water from the hands of the Doms whatever spritual excellency they might possess........Now it was Prabhu Jagadbandhu who saw how people professing to follow Sri Chaitanya were growing hypocrite and willfully neglecing the precepts and teaching of his creed. So as in the case of Faridpur Bagdis Probhu Jagadbandhu came foreward to devote these untouchables to the position of touchtable and adorable and he carried out his scheme into effect in the most satisfactory manner. The dome as a class were as if reborn to a life of piety and devotion.

অর্থাৎ ডোমগণ অধ্যাত্ম সাধনায় যত ঊৎকর্যই লাভ করুক না কেন, কেউই তাদের হাতের জল খেতো না এমনকি যাঁরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্ম প্রচার করতেন, তাঁরা পর্যন্ত না। শুধু তাই নয় । তাঁরা মহাপ্রভুর কাছে ডোমদের নিবেদিত প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না, সেই মন মানসিকতা বা নৈতিক সাহসও তাদের ছিল না। প্রভু জগদ্বন্ধু দেখলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচারের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা কপটাচারে লিপ্ত ও মহাপ্রভুর মত ও পথকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারে রত। তাই ফরিদপুর বাগদীদের উদ্ধার সাধনে তিনি যা করেছিলেন ডোমের ক্ষেত্রেও তাই করার জন্য আত্মনিবেদন করলেন। ফলে অস্পৃশ্য ডোমেরা হলো স্পর্শনীয়, পূজনীয়। শুধু উপদেশ দিয়ে নয়, নিজের আচরণ দিয়েই তিনি দেখালেন অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে। ডোমদের যেন নতুন জন্ম হল ।''

পরর্তীতে এই ডোম ভক্তরা প্রভু বন্ধু সুন্দরের দিব্যশক্তির প্রভাবে উত্তম খোলবাদক ও সুমিষ্ট কীর্তনীয়া হয়ে উঠেন । তাদের হরিকীর্তন তখন কলকাতার বিখ্যাত ছিল । গভর্ণর লর্ড কার্জনের শাসনামলে কলকাতায় তখন এক ভয়াবহ প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল । সে প্লেগের সময় (১৩০৭ বাংলা) শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ মহাত্মাদের নেতৃত্বে যে বিরাট শোভাযাত্রা হয়েছিল, সেই কীর্তনের পুরোভাগে ছিল এই ডোম সম্প্রদায়। সেই কীর্তন প্রভাবে প্লেগ চিরতরে নির্মূল হয়েছিল।

প্রভু বন্ধু সুন্দরের মহাউদ্ধারণ লীলায় শুধু অস্পৃশ্য ডোমেরাই স্পর্শনীয় হয়নি; সমাজের পতিতা, ঘৃণিতা যাদুমণি বাঈজী, সুন্দরী বাঈজী ও সুরতকুমারীও পূজনীয় হয়েছিলেন। তাদের দেবদুর্লভ অবস্থায় উন্নীত করে, প্রভু বন্ধু সুন্দর এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। একদিন যারা ছিল সমাজে-উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত, তারা হয়েছে আজ পরম বন্দনীয়। বারবিলাসিনী কঠোর ব্রহ্মচারিণী হলেন। পতিতা রমণী ব্রজের উজ্জ্বল রসের সন্ধান পেয়ে মঞ্জরী দেহ লাভ করলেন। এই অভাবনীয় পরিবর্তনে সোনাগাছির পতিতা মহলে এক অভিনব জাগরণ দেখা দিল ।

 তাঁর সমকালীন ভক্তদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ও বৈদ্যেরা থাকলেও , তাদের মধ্যে কোল, ভীল, সাঁওতাল, নমঃশুদ্র, কর্মকার, শীল, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের মানুষকে পাই। জাতি পরিচয় অজ্ঞাত লোকের সংখ্যাও তাঁর ভক্তদের মধ্যে কম ছিল না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা সে যুগে অভিনব। ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ছিলনা তাঁর কাছে। একদিকে উচ্চপদস্থ কর্মচারি, অন্যদিকে নিরন্ন হীন পতিত সবাই তাঁর কাছে স্বাগত। এখানেই শেষ নয়, অতুল চম্পটির মত উচ্চ বর্ণীয়, উচ্চ শিক্ষিত (তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিষয়ে এম, এ ইংরেজী, সংস্কৃত ও গণিত) ব্রাহ্মণ কুমারকে দিয়ে নমঃশূদ্রের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়ে জাতিভেদের মূলে নিদারুন আঘাত করলেন তিনি মানব ইতিহাসে এরূপ কথা ইতিপূর্বে আর শোনা যায় নি।

''অতুলে লইয়া পাবনায় গিয়া অরপিলা বুড়ো শিবের পায় ।

বঙ্কু চাড়ালের প্রসাদ খাওয়াইয়া শিব খাঁটি সোনা করিল তায় ।। ''

-বন্ধুলীলা মাধুরী ২/১৯৫

প্রেমের পথে সমন্বয়ের বাণী শুনিয়ে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর সামাজিক অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। সামাজিক গ্লানি, ভেদ-বিচার, হিংসা-দ্বেষে আচ্ছন্ন উনিশ শতকের বাঙালি সমাজকে তিনি মুক্তির পথ দেখালেন। সেই আত্মগর্বিত পান্ডিত্যের যুগে তিনি তাঁর ভক্তদের ''মাটির দিকে চেয়ে পথ চলো'' এই শিক্ষায় বলীয়ান করেছিলেন, এবং নিরভিমানী হয়ে অন্যকে মান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে অন্যায় ও অসাম্যকে মাথা পেতে সহ্য করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ইংরেজ শাসনকালেও ধর্মকর্মে ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রভু বন্ধু সুন্দরের প্রভাবে ফরিদপুরের আকাশ-বাতাস যখন হরিনাম কীর্তনে মুখর, তখন কীর্তন বিরোধী একদল লোকের পরামর্শে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে উঠল মহাক্রুদ্ধ । তার নির্দেশ বিনা লাইসেন্সে যেন শহরে কীর্তন শোভাযাত্রা না করা হয়। এই অন্যায় হস্তক্ষেপে প্রভু বন্ধু সুন্দর ক্রুব্ধ, এবং প্রতিবাদ স্বরূপ বিপুল ঊৎসাহ, উদ্দীপনায় বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে নগর পরিক্রমা করেছিলেন । এই গণ প্রতিরোধের সামনে সেই দিন ইংরেজ শাসনকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে । সেই যুগেও প্রভু বন্ধু সুন্দরের শক্তির আসল ঊৎস যে হরিনাম তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল-সেটা কম কথা নয় ।

জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথার শাসনে যারা ছিল মুহ্যমান, আর সাম্প্রদায়িক ভেদবিচারের কলরবে যারা ছিল অবজ্ঞাত, তাদের সকলকে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক শাসন অত্যাচার থেকে মুক্তির পথ দেখাল প্রভু বন্ধু সুন্দর । সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের ঊর্ধ্বে মানুষকে স্থাপন করে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মিলন ভূমি রচনা করতে চেয়েছিলেন। বহু শতাব্দীর ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন বাঙালি নতুন চোখে জীবন ও জগতের দিকে তাকাল-বুঝল, জন্মে নয়, কর্মেই মানুষের পরিচয়। বাঙালিকে এই আত্মপ্রত্যয় দেওয়ায়ই বোধহয় বাঙালি সমাজে প্রভু বন্ধু সুন্দরের সবচেয়ে বড় অবদান।

তথ্যসূত্র -

১। নাথ, শ্রীরাধা গোবিন্দ, '*মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ*', মার্চ-১৯৬৩, সাধনা প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১২

২। নাথ, শ্রীরাধা গোবিন্দ(সম্পাদিত), *'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*'(আদি লীলা), এপ্রিল-১৯৬৩, সাধনা প্রকাশনী, কলকাতা-৯

৩। ব্রহ্মচারি, মহানামব্রত, *'শ্রীগৌর সন্দর্ভ*', চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই-২০১৩, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, কলকাতা-৫৯

 ৪। শরীফ, আহমদ, *'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*'(২য় খন্ড), ডিসেম্বর- ১৯৮৩, মুক্তধারা, ঢাকা

৫। ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত,*'শ্রীমদ্ভাগবতম*' ১০ম সংস্করণ, জুলাই-২০০৯, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, কলকাতা-৫৯

৬। হালদার, গোপাল, '*বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*'(১ম খন্ড), প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-১৯৭৪, মুক্ত- ধারা, ঢাকা

৭। ব্রহ্মচারী, গোপীবন্ধু, 'বন্ধুলীলা তরঙ্গিণী' ( অখণ্ড ) প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-১৯৯৯, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, কলকাতা-৫৯

৮। ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত, 'শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা মাধুরী', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮১ সাল, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, কলকাতা-৫৯

সাদাত হাসান মান্টো’র রচনায় দেশভাগ ও দাঙ্গা : গল্প যখন ইতিহাস

 অনুপম সরকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

“দেশ বিভাগের দু-তিন বৎসর পর পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের সরকারের খেয়াল হল কয়েদীদের মতো পাগলদের ও আদান প্রদান হওয়া প্রয়োজন । অর্থাৎ যে মুসলমান পাগল হিন্দুস্তানের পাগলা গারদে আছে তাদের পাকিস্তানে এবং যেসব হিন্দু ও শিখ পাকিস্তানের পাগলা গারদে আছে হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।” এই টুকু পড়ার সাথে সাথেই আমাদের মনে পড়ে যায় ‘টোবা টেক সিং’ গল্পের কথা, মনে পড়ে জনপ্রিয় উর্দু গল্পকার সাদাত হাসান মান্টো’র কথা। অবিভক্ত ভারতে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সমব্রালা গ্রামে ১৯১২ সালের ১১ মে তাঁর জন্ম । দীর্ঘ জীবন তাঁর ছিলনা । ১৯৫৫ সালের ১২ জানুয়ারি পাকিস্তানে তাঁর মৃত্যু হয় । জন্মশতবর্ষ পেরিয়ে এসে মান্টো কে আজ উপমহাদেশের দাঙ্গা ও দেশ ভাগের শ্রেষ্ঠ কথাকার মনে হয় আজ বিনা বাধায় বলা যায় ।

মান্টোর লেখালেখির জীবন দুই দশকের। এসময় লিখেছেন ২২টি গল্পগ্রন্থ, ৫টি বেতার নাটক ও একটি উপন্যাস । তাঁর লেখালেখির জীবন ও সমকালীন উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্রমপঞ্জি মিলিয়ে দেখা যাবে, তিনি ব্রিটিশ শাসনের চূড়ান্ত পর্যায়, দেশভাগ ও উপনিবেশ-উত্তর পাকিস্তানের মূলধারার ইতিহাসের এক অস্বস্তিকর সাক্ষী। তাঁর নির্মম সমালোচনার আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে সমাজের সমস্ত কৃত্রিম জাঁকজমক, সমস্ত স্থিতাবস্থা ।

কথাসাহিত্যিক রবিশংকর বলের উপন্যাস ‘দোজখ্‌নামা’ । উপন্যাসে প্রধান চরিত্র দুইজন । একজন ফারসি কবি মির্জা গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯), অন্যজন উর্দু সাহিত্যের অন্যতম ছোটগল্পকার সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫)। উপন্যাসে দুইজনেই কবরের মধ্যে বসেই একে অন্যকে নিজেদের কাহিনী বলতে শুরু করে । আঠারোশো সাল থেকে শুরু করে উনিশশো পঞ্চাশ-- প্রায় দেড়শ বছরের ইতিহাস এই উপন্যাসের মধ্যে উঠে এসেছে গালিব আর মান্টোর বয়ানে । মান্টো যে জ্বলন্ত সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে নির্মমতা, ক্রুরতা, অমানবিকতা নৈমিত্তিক ছিল। মান্টো সেগুলোর কাহিনীই লিখেছেন। “শালা, শুয়োর কাহিকা, ‘ঠাণ্ডা গোশত’ লেখো, এতো বড়ো কাফের তুমি? কী বলে ওরা, শুনেছ? শুধু নারী-পুরুষের মাংসের গল্প লিখেছ, রেড লাইট এরিয়া ছাড়া আর কী আছে তোমার লেখায়। হাত তুলে দিলাম মির্জাসাব, না কিছু নেই। হত্যা আছে, ধর্ষণ আছে, মৃতের সাথে সঙ্গম আছে, খিস্তির পর খিস্তি আছে- আর এইসব ছবির পেছনে লুকিয়ে আছে কয়েকটা বছর- রক্তে ভেসে যাওয়া বছর- ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮- আছে নো ম্যানস ল্যান্ড, দেশের ভেতরে এক ভূখণ্ড যেখানে টোবা টেক সিং মারা গেছিল ।”

দেশ ভাগের যন্ত্রণা, ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার, দাঙ্গার আতঙ্ক, মানবতার অবমাননা, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বিদ্বেষ নিপুন দরদে ঘুরে ফিরে আসে তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পে । মান্টো নিজেই ‘আমার পাঠকদের প্রতি’ লেখায় বলেছেন – ‘দেশভাগের বিরুদ্ধে আমি সব সময় গর্জে উঠেছি, বিদ্রোহ করেছি । আজ আমি একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি । অবশ্য সব কিছুর পরেও আমাকে দেশভাগের ভয়ঙ্কর বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়েছে, কিন্তু তার জন্য আমি হতাশার সমুদ্রে ডুবে যাইনি । বরং সেই রক্তের সমুদ্রে আমি সরাসরি ঝাঁপ দিয়েছি আর মানুষ মানুষের কত বড় ক্ষতি করেছে তার জন্য, ভাই ভাইয়ের শিরার থেকে শেষ রক্তফোঁটা কিভাবে শুষে নিচ্ছে তাঁর জন্য কুড়িয়ে এনেছি অনুশোচনার কয়েকটা মুক্তো । আবার কিছু মানুষ মানবিকতাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারেনি, এর জন্যে সারা জীবন তাদের চোখের জল ঝরাতে হয়েছে । আমি সেই চোখের জল কুড়িয়ে এনেছি । এই মুক্তর দানাগুলো সাজিয়ে লিখেছি ‘সিয়া হাশিয়ে’ বইটি । ছোট ছোট জীবন্ত চিত্র যেন দাঙ্গার দলিল । দাঙ্গার সময় এক গরিব এক বস্তা চাল নিয়ে পালাচ্ছিল, পুলিশ গুলি চালায় । সে পালাতে পারেনা । বস্তাটা ওর উপর চাপিয়ে থানায় নিয়ে আসে । থানায় সে বলে, ‘হুজুর, অন্য লোকেরা বড় বড় জিনিসপত্র নিয়ে গেছে......আমি তো কেবল একটা একটা চালের বস্তা নিচ্ছিলাম...হুজুর, আমি খুব গরিব.... রোজ একটু ভাল খেতাম....’এসব বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে অর ময়লা টুপিটা দিয়ে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে আর চালের বস্তাটার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে দারগা বাবুর সামনে হাত পাতলে : ‘আচ্ছা, হুজুর, আপনি চালের বস্তাটা আপনার কাছে রাখুন... আমি আমার মজুরিটা চাচ্ছি... চার আনা ।’ পরিস্থিতির এমন বর্ণনা ইতিহাস ছাড়া আর কি?

দাঙ্গায় মানুষের প্রাণের মূল্য বলে কিছু ছিল না । হত্যাকারীরা পেশাদার খুনি ছিলনা । ধর্মীয় উন্মাদনা মানুষ কে অমানুষ করে তুলেছিল । হাজার হাজার মানুষ ‘অকারণে’ মরে যেতে লাগল । আর একটি চিত্র – ‘সকাল ছ’টায় পেট্রোল পাম্পের পাশে হাতে-টানা গাড়িতে বরফ বিক্রি করা লোকটাকে ছুরি মারা হল । সাতটা অবধি তার লাশ রাস্তায় পড়ে রইল । তার উপর বিন্দু বিন্দু বরফ জল পড়তে লাগল । সওয়া সাতটায় পুলিশ লাশ উঠিয়ে নিয়ে গেল; বরফ আর রক্ত সেই রাস্তাতেই পড়ে রইল । তারপর একটা টাঙ্গা পাশ দিয়ে চলে গেল । বাচ্চাটা টাটকা রক্তে জমে যাওয়া চকচকে দলাটা দেখল : ‘মা দেখো, জেলি....!’ এমন অনেক চিত্র যা মনকে আজও ভারাক্রান্ত করে তোলে ।

‘সহায়’ গল্পে ধর্ম সম্পর্কে মান্টোর সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায় । তিন বন্ধু একসাথে থাকতো । দাঙ্গায় যুগলের কাকা মারা যায় । বন্ধু মমতাজের প্রশ্নের উত্তরে যুগল বলে, এই মহল্লায় দাঙ্গা লাগলে সে মমতাজ কে খুন করে ফেলবে । আত্যন্ত আঘাত পেয়ে মমতাজ করাচি চলে যেতে চায় । যাওয়ার আগে সে বলতে থাকে – “এটা বোলো না যে এক লাখ হিন্দু ও এক লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। বল, দুই লাখ মানুষকে খুন করা হয়েছে... দু’লাখ মানুষের মৃত্যুর চেয়েও আসল ট্র্যাজেডি হল, যারা খুন হয়েছে তারা কোন হিসাবের খাতাতেই ঢোকেনি । এক লাখ হিন্দু মেরে মুসলমানরা ভেবেছে, হিন্দুত্ব নিকেশ হয়ে গেছে, কিন্তু তা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবেও... এই ভাবে এক লাখ মুসলমানকে কোতল করে হিন্দুরাও নিশ্চয়ই বগল বাজিয়ে বলছে, ইসলাম খতম হয়ে গেছে... কিন্তু তোমরা তো সবাই জানো, ইসলামের গায়ে একটা আঁচড় ও পড়েনি ... বেওকুফরাই ভাবতে পারে বন্দুক দিয়ে ধর্মকে শিকার করা যায়... ধর্ম, দীন, ইমান, বিশ্বাস – এসব তো আমাদের শরীরে থাকে না, থাকে আত্মায় । ছুরি, তলোয়ার বন্দুক দিয়ে তাদের হত্যা করা যায় না ।” মান্টো চিরদিন এই বিশ্বাস নিয়েই বেঁচেছেন । উর্দু সাহিত্যে মান্টোর মূল অবদান হল যে তিনি দেশত্যাগের সময় হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান হত্যাযজ্ঞকে ধর্মের বাইরে মানবতার হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন ।

আজ যখন পাকিস্তানে ইদের উৎসবের মধ্যেই সংখ্যালঘু হিন্দুদের অপহরণ করা হয়, পরিবারের মেয়েদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করে নেয় ক্ষমতাবানরা, হিন্দু মেয়ে কে ভালবাসার অপরাধে যখন মুসলিম একটি ছেলেকে বেমালুম গায়েব হয়ে যেতে হয়, তার পাসপোর্ট করতে না-পারায় তিন দিনের নবজাতককে প্রতিবেশীর কাছে বরাবরের জন্য রেখে দিয়ে যখন এক হিন্দু মা বাকি সন্তানদের বাঁচাতে এ দেশে থেকে যেতে চান, ‘স্বাধীনতা ও দেশভাগের মান্টো-কৃত বিশ্লেষণ বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । ভাগলপুরে দাঙ্গায় নিহতদের শব মাটি-চাপা দিয়ে যখন তার উপর কচি-সবুজ ধানের চারা রোপণ করা হয়, ‘জয়শ্রীরাম’ বলতে অস্বীকৃত ইমামের ধড়মুণ্ড আলাদা করে সুরাতে যখন তাঁর আজীবন বোরখাবৃত স্ত্রীকে নগ্ন করে গণধর্ষণ করার চলচ্চিত্র ভিডিও-বন্দি করে যৌথ উপভোগ করা হয়, বা গুজরাতে জীবন্ত সংখ্যালঘু পোড়ানোর সময় ‘হর-হর-মহাদেব’ ধ্বনি ওঠে, সেই পৈশাচিকতাকে পোকায়-কাটা স্বাধীনতায় বিভক্ত উপমহাদেশে বড়ই মান্টো-প্রতিম মনে হয় । ’

মান্টো ব্রিটিশ আমলে ‘বু’, ‘কাল সালোয়ার’ প্রভৃতি গল্পের জন্য যেমন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি পাকিস্তান আমলেও ‘ঠান্ডা গোশত’, ‘খুলে দাও’, ‘উপর, নিচে ও মাঝে’ গল্পগুলির জন্য দেশের মূল্যবোধের বিরোধী হিসেবে অভিযুক্ত হন। দুই আমলেই আইনের ধারা ২৯২। ব্রিটিশ আমলে অশ্লীলতা ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে আর পাকিস্তান আমলে অশ্লীলতা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ আমলে বিত্তবান তরুণ রনধির এক বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যায় ভিজে-কাপড়ে  সমাজের নিচু শ্রেণির এক মজদুরনিকে তার বিলাসবহুল ঘরে আশ্রয় দিয়ে কালক্রমে সম্ভোগে লিপ্ত হয় । এই যৌনতায় সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তার ঘামে-ভেজা শরীরের দুর্গন্ধ, যা রণধীর নিজের সর্ব শরীর ও চেতনা দিয়ে আকণ্ঠ পান করে। গল্পের শেষে জেলাশাসকের গ্র্যাজুয়েট কন্যার সঙ্গে বাসররাত্রির আসঙ্গেও রণধীর সেই গন্ধের অনুপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ের গায়ের সুবাসে কামার্ত হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয় । (‘বু’) ।

‘ঠাণ্ডা গোস্ত’ গল্পে দেখি, দেশভাগের সময়কার দাঙ্গায় মুসলমানের রক্তে হাত রাঙানো শিখ যুবক ঈশ্বর সিংহ ঘরে ফিরে কিছুতেই প্রেমিকা কুলবন্ত কাউরের সঙ্গে সঙ্গম করতে পারছে না ।  প্রেমিকার প্রশ্নের উত্তরে মুমূর্ষু ঈশ্বর স্বীকার করে, এই কৃপাণ দিয়ে ছ’জনকে খুন করেছি আর খুব সুন্দর একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে এসেছি । কুলবন্ত, আমি তাকেও খুন করতাম, কিন্তু একবার মনে মনে হল তোকে তো প্রতিদিনই পাই । এমন সুন্দর একটি মেয়েকে একবারও ভোগ করব না ? ঈশ্বর সিং সেই সুন্দরীকে কাঁধে নিয়ে খালের ধারে একটি ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দিল। তারপর শুরু করল প্রাক শৃঙ্গার পর্ব । তারপর যখন ব্যাপারটা ঘটতে যাবে তখন টের পেলাম এটা একটা মৃতদেহ । আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে । পুরোপুরিই ঠাণ্ডা গোস্ত । আখ্যানের তীব্র সংবেদনশীলতা না বুঝেই -- ‘আমরা মুসলমানরা এতই আত্মমর্যাদারহিত যে আমাদের মৃত কন্যাদেরও শিখরা ধর্ষণ করে যায় ?’—এমন প্রশ্ন তুলে লাহোর আদালতে মান্টোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় ।

আর একটি গল্প ‘খুদা কি কসম । দেশ ভাগ হয়ে গেছে। হাজার হাজার মুসলমান আশ্রয়ের খোঁজে পাকিস্তান যাচ্ছে, হাজার হাজার হিন্দু ভারতে আসছে । একজন শরণার্থী লিয়াজোঁ অফিসার জানিয়েছে । এক বিধ্বস্ত মহিলার সাথে তার বহুবার দেখা হয়েছে ভারতে । পাতিয়ালায় দাঙ্গার সময় তার একমাত্র মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। মেয়েটা খুন হয়ে থাকতে পারে এটা কোন মতেই সে বিশ্বাস করছে না । খুন ? না, কেউ আমার মেয়েকে খুন করতে পারে না । কেন ? কারণ সে অনেক সুন্দর। এত সুন্দর মেয়েকে কেউ খুন করতে পারে না। এত সুন্দর মেয়েকে কেউ আঘাতও করতে পারে না। মাসের পর মাস বছরে পর বছর ধরে মেয়েকে খুঁজে চলেছে । বুড়ির চুলে জট পড়েছে, চোখেও আজকাল আর ভাল দেখতে পায়না । লিয়াজোঁ অফিসারের চোখে পড়ে একটি দম্পতি, যুবক সুন্দর ও হ্যান্ডসাম, তার স্ত্রীর মুখ শাদা চাদরে অংশিক ঢাকা । যুবকটি শিখ । বৃদ্ধাকে অতিক্রম করার সময় যুবক হঠাৎ থামল, দু এক পা পিছিয়ে এসে যুবক মেয়েটিকে বলল, তোমার মা । মেয়েটি এক মুহূর্তের জন্য পেছনে তাকিয়ে চাদরে মুখে ঢেকে যুবকের হাত ধরে বলল, চল তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাই । মহিলা চিৎকার করে উঠল, ভাগবরী, ভাগবরী । ভাগবরী মানে বাগ্যবতী । লিয়াজোঁ অফিসার দ্রুত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কাকে দেখেছ ? উন্মাদিনী বলল, আমার মেয়ে ভাগবরীকে । তাঁর চোখ আলোকে উদ্ভাসিত । লিয়াজোঁ অফিসার বলল, মিথ্যে কথা । তোমার মেয়ে মৃত । না, তুমি মিথ্যে বলছ । লিয়াজোঁ অফিসার তখন বলল, খোদাকি কসম তোমার মেয়ে মৃত । বৃদ্ধা তখনই রাস্তায় পড়ে গেল । তখনই তার শেষ নিঃশ্বাস টুকুও বেরিয়ে গেল ।

আর একটি গল্প ‘খুল দো’ । দাঙ্গায় স্ত্রী হারানো সিরাজুদ্দিন অস্ত্রবাহী আট মুসলিম যুবকের একটি দলের উপর তাঁর মেয়ে সাকিনাকে খুঁজে বের করে আনার জন্য ভরসা করেন ।  যুবকরা বলে, মেয়ে বেঁচে থাকলে নিয়ে আসব । এক দিন সন্ধ্যায় সিরাজুদ্দিনের চোখে পড়ে চারজন মানুষ এক অজ্ঞান তরুণীকে ক্যাম্প হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। তিনিও পেছন পেছন যান । স্ট্রেচারে শায়িত কেউ একজন । কেউ একজন আলোর সুইচ টিপতেই তার চোখে পড়ল বাম গালে তিল। তিনি চিৎকার করে উঠেন, সাকিনা । যে ডাক্তার সুইচ টিপে ছিলেন, বুড়ো সিরাজুদ্দিনের দিকে তাকান । আমি এই মেয়ের বাবা । ডাক্তার মেয়েটিকে পরীক্ষা করলেন, জানলাটা দেখিয়ে বুড়োকে বললেন, খুলে দাও, ‘খুল দো’ । তখন স্ট্রেচারে শোয়া মেয়েটি নড়ে উঠল । এই অজ্ঞান অবস্থাতেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার হাত পড়ল সালোয়ারের ফিতেয় । যন্ত্রণাকাতরতার মধ্যই সে ফিতে খুলে সালওয়ার নামিয়ে দিল, বেরিয়ে এল তার ঊরুদেশ ।

১৯৫৫ সালের ১৮ জানুয়ারি । আগেরদিন এক বীভৎস গল্প শুনে সারাদিন মদ খেয়ে কাটিয়েছেন মান্টো । ভারত থেকে আসা মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে তীব্র শীতের রাতে ফেলে রেখে যায় প্রিয় পাকিস্তানের সভ্য এক দল নাগরিক । তীব্র শীতে মৃত্যু ঘটে মা ও মেয়ে দুজনেরই ।  কিছু একটা লিখতে হবে এই ঘটনার প্রতিবাদে । সকাল দশটার দিকে হঠাৎ তীব্র খিচুনি শুরু হয় । তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর । হাসপাতালে নেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স আসে। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মান্টো অ্যাম্বুলেন্সে মারা যান। গল্পটা আর লেখা হয় না।

নাভিদা ভ্যালেন্তিনা একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন “মান্টো শুধু তাই লিখেছেন যা তিনি দেখেছেন,…এবং সেটাই, যা জনগণ দেখতে চায় নি !” আর মান্টোর ভাষায় --‘যে যুগে আমরা বিচরণ করছি, সে যুগ সম্পর্কে যদি আপনি অপরিচিত হন, তবে আমার গল্প পড়ুন । যদি আপনি আমার গল্প সহ্য করতে না পারেন, তবে বুঝতে হবে এ যুগ কে আর সহ্য করা যাচ্ছে না । আমার মধ্যে যে ত্রুতি-বিচ্যুতি আছে, তা এ যুগেরই ত্রুতি-বিচ্যুতি । ....আমি সেই সংস্কৃতি, সেই সভ্যতা, সেই সমাজকেই টুকরো টুকরো করবো, যা স্বয়ং নাঙ্গা—উলঙ্গ ।’ কেন গল্প লেখেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর প্রতিরোধহীন উচ্চারণ, ‘লেখকের অনুভূতি যখন আহত হয়, তখনই সে কলম তুলে নেয় ।’ এই ক্ষত থেকেই সৃষ্টি হয় এক একটি গল্প । মান্টো বলেন, ‘আজকের লেখক তৃপ্তিহীন মানুষ । তাঁর পরিবেশ, ব্যবস্থা, সমাজ, এমনকি নিজের সত্ত্বা নিয়েও তাঁর পরিতৃপ্তি নেই ।’

এই তৃপ্তিহীন মানুষটার ভিতরে সবসময় জ্বলছে আগুন । মন্টোর কথায়, ‘স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি উপরে থাকে আমার তাপমাত্রা আর তা থেকেই বুঝবেন, আমার ভিতরে কি আগুন জ্বলছে ।’ এই আগুন তাঁকে সারাজীবন পুড়িয়ে ছারকার করে দিয়েছে । এখানেই তিনি তাঁর সমসাময়িক রাজিন্দর সিং বেদী, কৃষাণ চন্দর, আহমদ নাদিম কাসিমি, ইসমত চুঘতাইদের থেকে আলাদা । তাই তিনি তাঁর ‘এপিটাফ’-এ লিখে যেতে পারেন, ‘এই সমাধিতে টন-টন মাটির তলায় শুয়ে আছে সেই ছোটগল্পকার, যে ভাবছে, খোদা, নাকি সে নিজে, কে বেশি ভাল গল্পকার!’

তথ্যসূত্র -

১ । সাদাত হাসান মান্টো রচনা সংগ্রহ : ভূমিকা ও সম্পাদনা – রবিশঙ্কর বল ।

২ । মান্টোর শ্রেষ্ঠ গল্প : অনুবাদ -- কমলেশ সেন ।

৩ । আমরা সে ভাবে তাঁকে পড়লামই না – গৌতম রায় : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১/০৫/২০১৩ ।

৪ । পথিকৃৎ (শারদ সংখ্যা) : অক্টোবর, ২০১৩ ।

৫ । The Prity of Partition : Manto’s Life, Times and Work Across the India-Pakistan Divide – Ayesha Jalal .

৬ । শোহরত : ৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ।

৭ ।তিনি বলেছেনঃ [খুল দো, ঠাণ্ডা গোস্ত কিংবা খুদা কি কসম - The Daily Janakantha](http://www.dailyjanakantha.com/news_view.php?nc=21&dd=2012-05-18&ni=96682)www.dailyjanakantha.com › ... › [সাময়িকী](http://www.dailyjanakantha.com/index.php?nc=21&dd=2012-05-18) : May 18, 2012 ।

৮ । [সাদাত হাসান মান্টো: একশ পাওয়ারের বাল্ব — সামসুদ্দোজা ...](http://shorbojon.wordpress.com/2013/12/04/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%B6-%E0%A6%AA%E0%A6%BE/)

**shorbojon.wordpress.com/.../সাদাত-হাসান-মান... : Dec 4, 2013 ।**

৯ । [সাদাত হাসান মান্টো | সচলায়তন](http://www.sachalayatan.com/taxonomy/term/14276) [www.sachalayatan.com/taxonomy/term/14276](http://www.sachalayatan.com/taxonomy/term/14276) : May 17, 2012 ।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্য

আশিস রায়

গবেষক, বাংলা সাহিত্য

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

 ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রভাব বাংলাদেশে সে ভাবে বিস্তারলাভ না করলেও, ভারতবর্ষব্যাপী এই বিদ্রোহ সম্পর্কে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ এমনকি বাঙালিরাও উদাসীন থাকতে পারেননি। ১৮৫৭ সালে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। যেমন-

 জানুয়ারী মাসে : সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এনফিল্ড রাইফেল এবং গরু ও শুয়োরের চর্বি মাখানো টোটার গুজব ওঠে।

 ফেব্রুয়ারী ২৬ : বাংলাদেশে বহরমপুরে ১৯ নং নেটিভ ইনফ্যান্টি প্যারেড করতে অস্বীকার করে এবং তার ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা যায়।

 মার্চ ২৯ : ব্যারাকপুর সেনা ছাউনিতে মঙ্গল পান্ডের নেতৃত্বে সেনাবিদ্রোহ, ব্রিটিশ সামরিক আদালতের বিচারে তাঁর ফাঁসি হয় ৪ এপ্রিল, ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট, এরপরেই শুরু হয় দেশব্যাপী সিপাই বিদ্রোহের দাবানল। ঐতিহাসিকেরা এটিকে মহাবিদ্রোহ ও ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে থাকেন।**১**

 এপ্রিল ৬ : সামরিক আদালতে মঙ্গলপান্ডের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা।

এপ্রিল ৮ : ভোর ৫-৩০ মিনিটে মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ

 মঙ্গলপাণ্ডের মৃত্যু।

মে ১৩ : ফিরোজপুরে বিদ্রোহ ।

মে ২০ : আলিগড়ে বিদ্রোহ।**২**  প্রভৃতি একাধিক বিদ্রোহ সংঘটিত

 হয়।

এই সময় পর্বে ‘গোটা উনিশ শতকধরে বাঙালি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা ১৮৫৭-র বিদ্রোহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং তাদের সে চিন্তা বহুমুখী ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে।’**৩** উনিশ শতকের বাংলা রচনাগুলিকে সাধারণভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়-

১। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিশ্রিত স্মৃতিচারণ - দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

‘আমার জীবনচরিত’, কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’,

রাজনারায়ণ বসুর ‘আত্মচরিত’ প্রভৃতি।

২। গল্প-উপন্যাস - উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘নানা সাহেব’, কালীপ্রসন্ন

সেনের ‘বিজয়’, চণ্ডীচরণ সেনের ‘ঝান্সীর রানী’, প্রসন্নময়ী দেবীর

‘অশোকা’ প্রভৃতি।

৩। নাটক ও কবিতা - গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘ঝাঁসীর রানী’ (অসম্পূর্ণ)

নাটক, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রসন্নময়ী দেবী, কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির

কবিতা।

৪। চরিতকথা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুর্গাদাস লাহিড়ী, রজনীকান্ত গুপ্ত

প্রভৃতির লেখা ঝাঁসীর রানীর জীবন, কুমার সিংহের বীর কাহিনি প্রভৃতি।

৫। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা - রজনীকান্ত গুপ্তের পাঁচ

খণ্ডে সমাপ্ত ‘সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস’ প্রভৃতি।

‘১৮৫৭-র বিদ্রোহের সূচনাতেই বাংলার ধনপতি ও জমিদাররা ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।’**৪**  আর এই পর্বের লেখকরা তারা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সেখানে মূলত দুটি নীতি অনুসরণ করেছেন। একদল এই বিদোহের নায়কদের নিন্দা করে শাসকশ্রেণির মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিলেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন- দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অশোকা উপন্যাসের লেখিকা প্রসন্নময়ী দেবী, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি। এই সমস্ত লেখকদের চোখে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্যদল অবশ্যই এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু সমাজে বাস করে ব্রিটিশের বিরাট পাহাড় আকৃতি শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়নি। সেই কারনে বিদ্রোহের বিভিন্ন নায়ককে অবলম্বন করে তাঁদের সাহিত্য রচনা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বীর নায়কদের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই শ্রেণির লেখকরা হলেন- কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বরদাকান্ত সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি।

ইংরেজভক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বিদ্রোহী বাঙালী’ বা ‘আমার জীবনচরিত’, ‘জন্মভূমি’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর সমগ্র জীবনের ইতিহাস নয়। শুধুমাত্র সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন সময়ে জীবনের বিবর্তনের ইতিহাস। ইংরেজ সিপাহীদলের সদস্য দুর্গাদাস বেরিলিতে কিছুদিন ছিলেন তারই কিছু স্মৃতি তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। তিনি এই জীবনচরিত অসাধারণ নিপুনতার সঙ্গে এঁকেছিলেন। আক্ষেপ এখানে যে তিনি ইংরেজদের নুন খেয়েছেন তাই গুন গেয়েছেন। নিরপেক্ষ ভাবে জীবনচরিত রচনা করেননি।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা সর্বেশ্বর মিত্র প্রভৃতি লেখকেরা শুধুমাত্র বিদ্রোহ বা বিদ্রোহীদের নিন্দাবাদ করেই ছাড়েননি। বিদ্রোহের মুখ্যব্যক্তিকেও নিন্দা করতে পিছুপা হননি। অপবাদ দিতে গিয়ে শালীনতার মাত্রাও লঙ্ঘিত হয়েছে।

প্রসন্নময়ী দেবী রচিত ‘অশোকা’ উপন্যাস সিপাহী যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। এটি মূলত কল্পকাহিনি। উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র অশোকা। তাঁর প্রণয়ী অরন্যকমল পিতৃ অনুরোধে ভিন্ন জাতীতে বিবাহ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। পরর্বতীকালে বিবাহের জ্বালা ভুলতে না পেরে সিপাহী দলে যোগদেন। এর মধ্যে রমেন্দ্রের সঙ্গে অশোকার বিবাহ হয় এবং তাদের একটি পুত্র সন্তানও হয়। অশোকার স্বামীর বদলি হয় লক্ষ্ণৌতে। তাঁর স্বামী ইংরেজ সেবক ডাক্তার ছিলেন। এরজন্য বিদ্রোহীরা তার বাড়ী আক্রমণ করে। আক্রমণকারীদের মধ্যে তারা অরন্যকমল থাকায় সেবার অশোকারা রক্ষা পায়। এখানে বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের তিনি পরিচয় দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে লেখিকা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। লেখিকা মনে করেন- রাজার প্রতি গুপ্ত বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়া কেবল স্বদেশের ও স্বজাতির দুর্ভাগ্য আরো ঘনীভূত করা হয়।

গোবিন্দ চন্দ্র লিখেছিলেন ‘চিত্ত বিনোদিনী’ উপন্যাস। সিপাইদের তিনি বর্বর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে মনে করতেন। এরা ইংরেজদের জয় জয়কার দেখতে পায় না। সেজন্য এরা বিদ্রোহ করে। লেখক ইংরেজ শিক্ষিত আর দশ জন বাঙালীর মত এই বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারেননি। উপন্যাসের নায়ক চারুচন্দ্রের মুখ দিয়ে তিনি এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। লর্ড ক্যানিংকে তিনি ‘মহাপুরুষ মহাত্মা’ বলেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের মূল পথ প্রদর্শক ছিলেন নানাসাহেব। সেই নানাসাহেবকে এখানে শঠ ও নিতান্ত হীনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। নানাসাহেব বিচারের প্রহসন করে ইংরেজদের কেমন অমানুষিক দণ্ড বিধান করতেন, লেখক এখানে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কানপুর হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নানার উপর চাপিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেন- ‘নানাসাহেবের ছাড়িয়া দেওয়া ব্যাঘ্রের শিকারখেলা মাত্র।’**৭** ইংরেজদের অত্যাচারের কোনদিক তিনি তুলে ধরেননি। নীল সাহেব কানপুরে যে তাণ্ডব চালান তাঁরও কোনও বর্ণনা তিনি করেননি।

সেযুগে ‘রাজভক্ত’ লেখক হিসাবে সে যুগে পরিচিত ছিল অনেকেই। রাজভক্ত লেখকদের মধ্যে সব থেকে বেশি বিখ্যাত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’ ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসা করে বাঙালীদের কাছে আবেদন জানান- ‘হে বাঙ্গালি মহাশয়েরা! এ বিষয়ে আপনাদের যুদ্ধ করিতে হবে না, অস্ত্র ধরিতে হইবে না, আপনারা সকলে একান্ত চিত্তে কেবল রাজা পুরুষগনের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়ন করুন। পরম পারৎপর পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে মহারানীর জয় হউক, লর্ড বাহাদুর অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া সর্বোতভাবে সুখী হউন। বিদ্রোহানল এখনি নির্বান হউক। ... আমার দিগের কিছুমাত্র ভয় নাই, ব্রিটিশ অধীনে যেমন সুখে আছি, চিরকাল সেইরূপ স্যখে থাকিব।’**৫**

এই অংশটুকু সম্পাদকীয়তে লিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মনে করলে ইংরেজদের প্রতি যথার্থ রাজভক্ত দেখানো হয়নি। সুতরাং ঐ সংখ্যাতেই ইংরেজদের স্তুতি প্রর্দশন করে দুটি কবিতা লিখলেন-

চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়।

ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়।।

এমন সুখের রাজ্য, আর নাহি হয়।

শাস্ত্রমতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয়।।

অন্যটি –

ভারতের প্রিয়পুত্র, হিন্দু সমুদয়

মুক্তমুখে বল সবে, ব্রিটিশের জয়।

 শুধুমাত্র ঈশ্বর গুপ্ত নন সংবাদ প্রভাকরের পাতায় প্রানগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র সাহা পদ্য লিখে বিদ্রোহীদের নিন্দা করেছেন এবং ব্রিটিশের জয় ঘোষনা করেছেন। শুধুমাত্র লেখককুল নয় ছাত্ররাও অনেকেই এতে সামিল হয়েছেন। যেমন হুগলী কলেজের ছাত্র অভয়চন্দ্র পাঁড়ে পদ্য লিখে ব্রিটিশের জয়ধ্বনি করেন –

জয় ব্রিটিশের জয় জয় ব্রিটিশের জয়

যতেক বিদ্রোহীদল যাক সব রসাতল

 প্রবল ব্রিটিশ বল হউক অক্ষয়

বল হউক অক্ষয়

 জয় ব্রিটিশের জয় জয় ব্রিটিশের জয়

ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাই ও নানাসাহেবকে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কটাক্ষ করেছিলেন। তিনি লিখলেন-

পিঁপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে।

হ্যাদে কি শুনি বাণ ।।

হ্যাদে কি শুনি বাণী ঝান্সীর রানী

ঠোঁটকাটা কাকী।।

মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি।

নানা তার ঘরের ঘরের ঢেকি।

নানা তার ঘরের ঢেঁকি মাগী খেকি।।

শেয়ালের দল।

এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে।

এই সময়পর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত একটি পদ্যে নানাকে ‘অবোধ সেপাইদলের গোদা’ বলেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানাকে বলেছেন- ‘নানা পাপে পটু’; ‘অর্ধমের অন্ধকারে কানা’ বলে চিহ্নিত করেছেন। নানাকে নিয়ে লিখেছেন-

কোথাকার মহাপাপ

কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ

পুত্র হল ‘নানা’

কাকের বাসায় যথা ককিলের ছানা।**৯**

বিদ্রোহের প্রতি একাংশ বাঙালি সমাজের যে কোন রকম সহানুভূতি ছিল না তা বোঝাই যাচ্ছে। তবে আর একদল লেখক এ সবের মধ্য না গিয়ে নিজেদেরকে নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সদর্থক চিন্তাভাবনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের রচনাতে। ‘ভারতী’র ১২৮৪ সালের অগ্রাহায়ন সংখ্যায় ঝান্সীর রানী সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তিনি সিপাহী যুদ্ধের বীরপুরুষদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন এবং বিশেষ করে রানীকে তিনি বীরের মুকুট পরিয়েছেন।

সিপাহীযুদ্ধের ‘প্রথম বাঙালী ইতিহাসকার রজনীকান্ত গুপ্ত।’১০ তাঁর ‘বীরমহিমা’ গ্রন্থে নারীচরিত পর্যায়ে লক্ষ্মীবাঈ-এর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনি নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক মনে করেন লক্ষ্মীবাঈ- ‘অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অদ্বিতীয় আস্পদ।’১১ ইংরেজদের অত্যাচার ও অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহনকল্পে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে- ‘স্বাধীনতার গৌরবরক্ষায় কৃত সংকল্প এবং আপনার লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলেন।’১২

উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তানায়কদের অনেকেই ঝাঁসীর রানীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। স্বামী বিবেকানন্দ রাণী সম্পর্কে উচ্চ মনোভাব প্রোষণ করতেন। গিরিশ চন্দ্রের মনোভাবও ছিল এমন। তাই শেষ প্রান্তে এসে তিনি রাণীকে নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। নাটকের দুটি অঙ্ক লেখার পর তিনি তাঁর হিতাকাঙ্খী এক পুলিশের পরামর্শে এই নাটক রচনা থেকে বিরত থাকেন।

ঝাঁসীর রানি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন- ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বলো, ঝাঁসীর রানীর চেয়ে কেউ উচ্চ নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই। বঙ্কিমের ইচ্ছা ছিল রাণীকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করা কিন্তু সাহেবদের অপ্রীতিভাজন হওয়ার ভয়ে তিনি এ পথে আর এগোননি।

‘খ্রিষ্টীয় সন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে কেহ কেহ সিপাহী যুদ্ধ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে উহা যুদ্ধ নহে বিদ্রোহ মাত্র। ... সিপাহী বিদ্রোহের মূলে স্বদেশানুরাগ বা অন্যকোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। সিপাহীরা পিশাচের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। যুদ্ধ ধর্ম প্রতিপালন করে নাই। বৃদ্ধ, রমণী, বালক যাহাকে পাইত তাহাকেই হত্যা করিত; শুধু ফিরিঈী নহে, স্বদেশীয়রাও তাহাদের হস্তে নিস্তার পাইত না। দেশ ইংরাজের স্বপক্ষে ছিল ... লোক ইংরেজের অনুকূল্যে করিত ... কোটি কোটি ভারতবাসী ইংরেজের জয় কামনা করিত।’**১৩** নগেন্দ্রনাথ মিত্র ‘অমরসিংহ’ উপন্যাসে শুধুমাত্র সিপাইদের অত্যাচারের চিত্রই অঙ্কন করেননি। তার সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের নৃশংসতা বর্ণনাও করেছেন। জনসাধারন যে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল তাও তিনি দেখিয়েছেন।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ অনেকের কাছে শুধুমাত্র বিলাসিতা আর সেজন্য তারা ইংরেজদের জয়গান করেছেন। আবার বহু লেখক এই আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন এবং সিপাহী বিদ্রোহকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই আন্দোলন শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে আজও বিতর্কিত হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র -

১। প্রবীর কুমার লাহা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপঞ্জী; কলকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ২০০০, পৃষ্টা- ৮ ।

২। অসিতাভ দাশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত তারিখ অভিধান; কলকাতা,

 পত্রলেখা, ২০১৪, পৃষ্টা- ৬৫ ।

৩। স্বপন বসু ; গন আন্দোলন ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কলকাতা,

 পুস্তক বিপণী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭, পৃষ্টা- ১০৩ ।

৪। তদেব

৫। সংবাদ প্রভাকর, ২০ জুন ১৮৫৭

৬। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ; বঙ্গভাষা, পৃষ্টা- ৫১৯ ।

৭। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ; চিত্তবিনোদিনী, কলকাতা ১৮৭৪, পৃষ্টা- ২২০ ।

৮। মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম, সম্পাদিত), কানপুরের যুদ্ধ জয় অংশের পৃষ্টা- ২৩২ ।

৯। তদেব, পৃষ্টা- ২৩০

১০। প্রাগুক্ত (সূত্র- ৩, পৃষ্টা- ১১৬)

১১। রজনীকান্ত গুপ্ত, বীরমহিমা, পৃষ্টা- ২৯ ।

১২। তদেব

১৩। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অমর সিংহ, পৃষ্টা- ৮৬ ।

গ্রন্থ-আলোচনায় জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে...

ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ ও খাদি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেত্রী সরলাদেবী তাঁর বহু অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত জীবন-কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থে। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে সরলাদেবীর মৃত্যুর ঠিক তিরিশ বছর পর ‘জীবনের ঝরাপাতা’ প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭২-এ তাঁর জন্মকাল থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তেত্রিশ বছরের জীবনস্মৃতি উঠে এসেছে এই ঝরাপাতার পৃষ্ঠায়। তবে শুধু নিজের জীবনের ঘটনাক্রমই নয়, বরং শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর মানসিক বিবর্তন ও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠার কাহিনি এই ‘জীবনের ঝরাপাতা’। সেখানে কোথাও তাঁর লেখা হয়েছে ঘটনাবাহী আবার কোথাও বা তাঁর সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ভাবনা-চিন্তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমকালীন সমাজ-মানসিকতা, রাজনৈতিক গতিবিধি ও সেইসঙ্গে লেখিকার বিশাল আত্মোপলব্ধি সংকলিত হয়েছে ‘জীবনের ঝরাপাতা’য়।

 সাহিত্য, সঙ্গীত, রাজনীতি – সবক্ষেত্রেই ছিল সরলাদেবীর অবাধ বিচরণ। যদিও তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রেই পাওয়া। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারীদেবীর সন্তান সরলা। তিনি নিজেও তাঁর জীবন গড়ে ওঠার পিছনে পিতামাতার অবদানের কথা আত্মস্মৃতির বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন।

 সরলাদেবী ‘জীবনের ঝরাপাতা’ লেখা শুরু করেছেন তাঁর জন্ম-কাহিনি দিয়ে। সূতিকাগৃহ থেকে আরম্ভ করে প্রথম কয়েক বছরের ঘটনা নিশ্চয়ই তাঁর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা নয়। যাইহোক, ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজের যে পার্থক্যটা তিনি খুব ছোটবেলা থেকেই অনুভব করেছিলেন, তা হল মায়ের স্নেহাভাব। এ-সম্পর্কে সরলাদেবী নিঃসঙ্কোচে লিখেছেন – “তিনি আমাদের অগম্য রানীর মতো দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত।” এমনকি কখনও কখনও নিজের পিতামাতার ‘একটি অধিকন্তু অপ্রার্থিত মেয়েমাত্র’ বলেও মনে হয়েছে তাঁর। মায়ের এই ঔদাসিন্যে তিনি মোটেও ‘অসুখী’ ছিলেন না – একথা বার বার বললেও মায়ের প্রতি তাঁর একটা চাপা অভিমান পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। তবে এই একাকীত্ব ও অবহেলাই হয়ত তাঁকে দিন-প্রতিদিন মানসিকভাবে সশক্ত করে তুলতে সাহায্য করেছিল। যদিও পরবর্তীকালে মায়ের সান্নিধ্যে এসে সেই অভিমান তাঁর মন থেকে অনেকটাই মুছে গিয়েছিল।

 পাঁচ বছর বয়সে সরলাদেবীর হাতে খড়ি হয়। সাত বছর বয়সে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। মাতুল রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ইংরেজি সাহিত্যের ওপর যে আগ্রহ তাঁর বাল্যকালেই জন্মেছিল, তার ফলস্বরূপ সতের বছর বয়সে এই স্কুল থেকেই ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে তিনি বি এ পাশ করেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজের আগ্রহে ফিজিক্স পড়েন এবং সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে রৌপ্যপদকও লাভ করেন। সইসঙ্গে ফার্সি এবং উর্দু পড়াও শিখেছিলেন। মহর্ষির দেওয়া হাফেজের কিছু পংক্তিতে সুর বসিয়ে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কৃতও হয়েছিলেন সরলাদেবী। এই গান পরবর্তীকালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মিস্টার সিওয়ানি সাহেব এবং বম্বের বদ্রুদ্দিন তায়েবজির পরিবারে আনন্দের তরঙ্গ এনেছিল। বি এ পাশের পর সংস্কৃত বিষয়ে এম এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাড়িতেই পণ্ডিত শীতলচন্দ্র বেদান্তবাগীশের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার আগেই মহারানী গার্লস্‌ স্কুলে চাকরি নিয়ে তিনি মহীশূরে চলে যান। সেকালে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের চাকরি করবার কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। পরীক্ষা দেওয়া হল না ঠিকই, তবে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা অবাধে এগিয়ে চলল।

 সংস্কৃতের জ্ঞান এবং কথোপকথন সম্পর্কে বাঙালি ছাত্র ও দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্রদের তুলনা করতে গিয়ে তিনি বঙ্গদেশের সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির দিকটি নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে প্রথমত, বাঙালি ছাত্রদের সংস্কৃত আওড়ানো হলেও তাঁদের কথোপকথনে অভ্যস্ত করা হয় না। দ্বিতীয়ত, বঙ্গের সমস্ত সংস্কৃত বই বাংলা লিপিতে – দেবনাগরী লিপিতে নয়। তৃতীয়ত, বাঙালি ব্যাকরণ শুদ্ধ কথা বললেও তাদের উচ্চারণে শুদ্ধতা নাই। বলাবাহুল্য, আজ থেকে বহু বছর আগে সরলাদেবী যে সমস্যার কথা বলেছিলেন, তা বাঙালি ছাত্রদের সামনে আজও সমানভাবে রয়েছে। বিভিন্ন ভাষা ছাড়াও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ইংল্যান্ডের ইতিহাস, ধর্ম, পুরাণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে সরলাদেবীর সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই আত্মজীবনী গ্রন্থে।

 সাহিত্য-ক্ষেত্রে সরলাদেবীর প্রথম আবির্ভাব ‘সখা’ পত্রিকার মাধ্যমে। এ সম্পর্কে লেখিকা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন –“সেইসময় ‘সখা’ নামে বালক-বালিকাদের জন্য মাসিক পত্রিকায় একটা কবিতা প্রতিযোগিতা ঘোষিত হল। মা উৎসাহ দেওয়ায় আমি সেই প্রতিযোগিতার জন্য দাঁড়ালুম। নির্দিষ্ট বিষয়ে কবিতা রচনা করে সখা অফিসে পাঠিয়ে দিলুম। ...প্রকাশ্য রচনায় এই আমার হাতেখড়ি।” তবে সরলাদেবীর প্রথম রচনা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, সখার ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত ‘পিতামাতার প্রতি কর্তব্য’ নামক প্রবন্ধ তাঁর প্রথম রচনা। প্রায় সমকালে বালক পত্রিকায় সরলাদেবীর কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। এ সময়ে ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণকুমারীদেবী। ভারতীর জন্য সরলাদেবীর প্রথম রচনা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান নিয়ে লেখা ‘বাংলা হাসির গান ও তার কবি’। তবে এই পত্রিকায় তাঁর অস্বাক্ষরিত হাস্যরসাত্মক রচনা ‘প্রেমিক সভা’ প্রকাশিত হবার পর থেকেই সাহিত্যিক মহলে তিনি পরিচিতি পেলেন। এই রচনা সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন – “এ যদি আমারই লেখা লোকে ভাবত, আমি লজ্জিত হতুম না।” এরপর সংস্কৃত কাব্যের আলোচনামূলক রচনা ‘রতি-বিলাপ’, ‘মালবিকা-অগ্নিমিত্র’, ‘মালতী-মাধব’, কবিতা আহিতাগ্নিকা’ ও ঋগ্বেদের মন্ত্র অবলম্বনে ‘শুনঃশেফের বিলাপ’ লিখে তিনি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৮/১৯ বছর। ‘মৃচ্ছকটিক’ সরলাদেবীর অসম্পূর্ণ রচনা। ‘কবি-মন্দির’ নাম দিয়ে এই রচনাগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশের চেষ্টা করা হলেও বিভিন্ন কারণে তখন তা সম্ভব হয়নি। আত্মজীবনী লেখা পর্যন্ত সরলাদেবীর সমস্ত রচনা ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। সেইসঙ্গে গ্রন্থাকারে ছিল ‘নববর্ষের স্বপ্ন’ নামক ছোটগল্প সংকলন, ‘বঙ্গের বীর’, কিছু আধ্যাত্মিক বিষয়ক বই এবং ‘শতগান’ নামক সংগীত সংকলন।

 পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খুব ছোট বয়সেই ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক আব্জবাবুর কাছে যখন গান শেখা শুরু হয়, সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর সহজাত প্রতিভার পরিচয় তখন থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির সংগীতময় পরিবেশে পরবর্তীকালে তা খুব সহজেই পরিপুষ্টি পেয়েছিল। সরলাদেবীর আত্মস্মৃতি থেকে জানা যায় মোটামুটি ১০/১১ বছর বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা ঠাকুরবাড়ির বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রবিমামার সঙ্গে সরলাদেবীর যোগাযোগ হয়েছিল ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাকে পিয়ানোতে প্রকাশ করা নিয়ে। এরপর রবীন্দ্রনাথের ‘সকাতরে কাঁদিছে সকলে’ ব্রহ্মসঙ্গীতকে পিয়ানোতে ইংরেজি বাজনার piece –এ পরিণত করেছিলেন তিনি। এর পুরস্কার স্বরূপ তাঁর বারো বছরের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি ছোট বই – ‘Socatore – composed by Sarola’. এই পুরস্কার সরলাদেবীকে একদিকে যেমন আপ্লুত করেছিল, অপরদিকে তাঁর সঙ্গীত সাধনার পথকে করেছিল আরও প্রশস্ত। রবিমামার উৎসাহেই তিনি ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী’, ‘হে সুন্দর বারেক ফিরাও’ প্রভৃতি গানকে বিদেশি ঢঙে গড়ে তুলেছিলেন। ইংরেজি প্রথায় গানগুলির স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন ইন্দিরা। পিয়ান ছাড়াও বেহালা এবং রুদ্রবীণা বাজানো শিখেছিলেন সরলাদেবী। বলাবাহুল্য এ দুটি বাদ্যযন্ত্রে দক্ষ হয়ে উঠতে তাঁর বেশিদিন সময় লাগেনি।

 গান শেখা ও গান তুলে নেওয়ার বাতিক ছিল সরলাদেবীর বাল্যকাল থেকেই। তিনি যেখান থেকে পেতেন কুড়িয়ে আনতেন গানের সুর। বোটের মাঝি থেকে বাউল গান শিখেছিলেন তিনি। এমনকি ভিখারিদের পয়সা দিয়ে তাদের থেকে গান তুলে নিতেও তাঁর কোন সঙ্কোচবোধ ছিল না। ‘কোন্‌ আলোকে প্রাণের প্রদীপ’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’, ‘আমার সোনার বাংলা’, ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’, ‘এসো হে গৃহদেবতা’, ‘একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ’, ‘চিরবন্ধু চিরনির্ভর’ – এমন বহু গানের সুর সরলাদেবী রবীন্দ্রনাথকে এনে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি ঝরাপাতায় লিখেছেন, “যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত থাকত – তাঁর মত সমজদার আর কেউ ছিলেন না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম – অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে, কখনো কখনো তার কথাগুলির কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন।”

 ‘বন্দে মাতরম্‌’ সঙ্গীতের প্রথম দুটি পদে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী ‘ত্রিংশকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদকরলে’ থকে শেষপর্যন্ত গানটি রবিমামার আদেশে সরলাদেবীই সুর বেঁধেছিলেন। শুধু সুর দেওয়াই নয়, এই গানের জনপ্রিয়তার মূলেও সরলাদেবীর অবদান অনেকখানি। ১৯০৫ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে বেনারস কংগ্রেসে প্রথমবার সরলাদেবী স্বয়ং এই গানটি গেয়ে সমবেত জনতার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে তিনি বহুজনকে গানটি শিখিয়ে সমস্বরে গাইতে সাহায্য করেছিলেন। ক্রমে মন্ত্রের মতো সমগ্র ভারতবর্ষে গানটি ছড়িয়ে পড়লে সরকারি আদেশে অনেক স্থানে তা গাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল।

 মহীশূরে শিক্ষকতা করবার সময়েই ১৩০২ বঙ্গাব্দে দিদি হিরণ্ময়ীর সঙ্গে যুগ্মভাবে সরলাদেবী ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে এই কাজ রবীন্দ্রনাথের হাতে যায়। কিন্তু পরের বছরই ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ভারতীর সম্পাদনার দায়িত্ব এককভাবে সরলাদেবী গ্রহণ করেন এবং ১৩১৪ পর্যন্ত এই দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করেছিলেন। ভারতীর শেষ সম্পাদকও সরলাদেবী। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৩৩১ থেকে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে ভারতী বন্ধ হয়ে যায়।

 ভারতীকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য তিনি বাঙালি লেখক ছাড়াও বাংলার বাইরের বিভিন্ন স্বনামধন্য অবাঙালির লেখা বাংলায় অনুবাদ করে পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছিলেন। যাঁদের মধ্যে বম্বে হাইকোর্টের জজ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, আর্য্যা নিবেদিতা, জাপানের শিতোবু হোরি, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ব্যারিস্টার সৈয়দ আমির আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

 পাঞ্জাবে থাকাকালীন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সরলাদেবী সাপ্তাহিক উর্দু রাজনৈতিক পত্রিকা ‘হিন্দুস্তান’-এর স্বত্বাধিকার নেন এবং বিখ্যাত উর্দু লেখক সুফী অম্বাপ্রসাদকে এর সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই পত্রিকায় সরকার-বিরোধী কিছু লেখা প্রকাশিত হওয়ায় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উগ্রপন্থী সৈনিককে সম্পাদক নিযুক্ত করার কারণে জেনারেল ও’ ডায়ারের আদেশে খুব শিগ্‌গিরি হিন্দুস্তান পত্রিকার উর্দু এবং ইংরেজি দুটি সংস্করণই বন্ধ হয়ে যায়। সেইসঙ্গে হিন্দুস্তান প্রেসও সরকারি আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়। কারাবরণ করতে হয় সরলাদেবীর স্বামীকেও।

 ঠাকুরবাড়ির স্বদেশি আবহাওয়ার প্রভাবে সরলাদেবীর মনে স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা বাল্যকাল থেকেই জাগ্রত ছিল। খুব ছোটবেলায় মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বিদেশ থেকে সপরিবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসেন, সাধারণ বাঙালি বাড়িতে তাঁদের বিদেশি চাকচিক্যময় জীবনযাপন আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যদের মত এই বিলাতি জীবনধারা সরলাদেবীর মনকে কখনোই আকৃষ্ট করতে পারেনি। সেই সময়কার একটি সামান্য ঘটনা তুলে ধরেছেন লেখিকা, যা থেকে দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি এইরকম – বাঙালিদের ও ইংরেজদের সার্কাস দেখতে যাওয়ার কথায় সরলাদেবী বাঙালি সার্কাস দেখতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তার একমাত্র কারণ ছিল দেশীয় মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ। পরবর্তীকালেও বহু সমৃদ্ধ ভারতীয় জাপান থেকে কাগজ আমদানি করে নিজেদের গর্বিতবোধ করাকেও সরলাদেবী মেনে নিতে পারেনিনি। তার প্রতিবাদে তিনি ভারতী পত্রিকার মলাট সম্পূর্ণ পরিবর্তীত করে দেশীয় পুঁথি লেখার তুলট কাগজ ব্যবহার করেছিলেন।

 বেথুন স্কুলের পরিবেশে সরলাদেবীর স্বদেশপ্রেমের প্রথম দীক্ষা হয়েছিল। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী কামিনী দিদি (কামিনী রায়) ও অবলা দিদি (লেডি অবলা বসু) – এঁদের প্রভাবে বাল্যকালের সেই স্বদেশপ্রেম উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। সে সময়ে নেটিভ খৃষ্টান মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের খৃষ্টান করবার জন্য ছলচাতুরী করে অথবা চুরি করে নিয়ে আসত। মিশনারীরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের নতুন ইংরেজি নাম দিত। কিন্তু এমন বহু খৃষ্টান নেটিভ মেয়ে ছিল, বেথুন স্কুলে ভর্তী হওয়ার পর যাদের স্বদেশপ্রীতি জেগে উঠেছিল এবং তারা মিশনারিদের দেওয়া নাম ও ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুত্বকে আবার গ্রহণ করে নেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জেলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে স্কুলের নেত্রীদের নির্দেশে যখন জামার আস্তিনে কালো ফিতে বাঁধলেন, তখন থেকেই ‘একটা বড় কিছুর সঙ্গে যুক্ত’ হওয়ার অনুভূতি তাঁর মনকে আনন্দে ভরে তুলেছিল। যদিও কী কারণে এই কালো ফিতে বেঁধেছিলেন, তা বুঝে ওঠবার বয়স তখনও তাঁর হয়নি।

 দেশসেবার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল বলেই মাত্র ১০/১১ বছর বয়সে দিদি হিরণ্ময়ীর পরামর্শে কাশিয়াবাগানের পাড়ার মেয়েদের জন্য তাঁরা দুই বোনে মিলে একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। দিদি ছিলেন সেই পাঠশালার প্রধান শিক্ষিকা এবং সরলা ছিলেন তাঁর সহকারী। তবে বিভিন্ন কারণে পাঠশালাটি বেশিদিন চালানো সম্ভব হয়নি। তার বহুকাল পরে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য ‘ভারত স্ত্রী শিক্ষা-সদন’-এর স্থাপনা করে বাল্যকালের সেই স্বপ্নকে তিনি সফল করতে পেরেছিলেন। শুধু শিক্ষা প্রচারই নয় দেশের মেয়েদের জন্য স্বদেশি বস্ত্র ও দ্রব্য নিয়ে তিনি নিজের খরচে বাড়িতে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ খুলেছিলেন। যোগেশ চৌধুরী ও সরলা দেবীর মিলিত প্রচেষ্টায় বৌবাজারে ‘স্বদেশ স্টোর্স’ও খোলা হয়েছিল। এই সময় বম্বেতে এক স্বদেশী এগজিভিশনের জন্য তাঁর ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে বহু সামগ্রী পাঠানো হয়। যার জন্য তিনি একটি মেডেলও পেয়েছিলেন। মেডেলটি চিরকাল তিনি ব্রোচের মতো শাড়ির সঙ্গে ব্যবহার করতেন। মহাত্মা গান্ধির ভারত আগমন ও স্বদেশি আন্দোলন প্রচারের বহু আগে থেকেই যে সরলা দেবী স্বদেশ প্রেমকে তাঁর জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন, এথেকেই তা স্পষ্ট হয়। পরবর্তীকালে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি গান্ধীজীর অন্যতম পরামর্শদাত্রী এবং খাদি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

 মহীশুরে ছ’মাস চাকরি জীবন কাটানোর পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করলেন। যে চাকরি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবল ইচ্ছে নিয়ে তিনি বাড়ি থেকে একা বেরিয়েছিলেন সে ইচ্ছে বৃহত্তর রূপ নিয়ে অচিরেই দেশ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হল। জীবনের মূল লক্ষ খুঁজে পেয়ে তিনি দেশের যুবকদের ‘সাহস, বল, বিদ্যা, একতা ও স্বায়ত্তশাসন’- এই ষড়মার্গে চালিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই উদ্দেশ্যের সূত্রপাত হল যুবক সংগঠনকে দেশসেবার শপথ করিয়ে নিয়ে তাদের হাতে রাখি বেঁধে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এই অনুষ্ঠানই বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আরও বৃহত্তর রূপ নিয়েছিল।

 রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর গল্পগুচ্ছের একটি গল্পে বাঙালি সম্পর্কে অপমানজনক উক্তিতে ক্রুদ্ধ সরলা দেবী তাঁর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁকে বাঙালির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, বাঙালি ছেলেদের শারীরিক দিক থেকে শক্তিমান করে তোলার জন্য নিজের বাড়িতে ব্যায়ামাগার খুলেছিলেন। তাঁর মতে, বাঙালি যুবকদের যে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করবার জন্য সবসময় শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। কারণ বীরের মন্ত্র- ‘বলং বলং বাহুবলং’ এবং ধীরের মন্ত্র ‘ ব্রহ্মতেজো বলং বলং’- এই দুইয়ের সমাবেশ থাকলে তবেই জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। তাই তিনি বাঙালির ভীরুতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন কঠোর শব্দে- ‘আক্রমণ করলে একটি পোকামাকড়ও কামড়ায়- শুধু বাঙালিই কি সাত চড়ে রা কাড়বে না? এত মনুষ্যত্বের অভাব তার চিরকাল? এত হীনতা?’ বাঙালি যুবকদের মনের এই ভীরুতাকে দূর করবার জন্য তিনি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ‘বীরাষ্টমী উৎসব আরম্ভ করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন বীর পুরুষদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের মতো অন্যায়ের প্রতিবাদ ও দুষ্টকে দমনের সংকল্প নেওয়াই ছিল এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে দেশের যুব সমাজকে প্রেরিত করবার জন্য তিনি বহু স্থানে বক্তৃতার আয়োজন এবং ভারতী পত্রিকাতেও ‘যুদ্ধসংগীত’, ‘আহ্বান’, ‘উদ্বোধন’, ‘অগ্নিপরীক্ষা’ প্রভৃতি কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন। তিনি জানতেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতিকে সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই তিনি বলেছেন, “একতা কীসে হয়; স্বার্থ যদি এক হয় তবে লক্ষও এক হবে।.........দেশহিতৈষণা শুধু সেন্টিমেন্টের ওপর, শুধু ভাবের একটা ধোঁয়ার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তার নজরে একটা স্পষ্ট solid বস্তুর ছবি ফুটে ওঠা চাই- সর্বহিতে আত্মহিত আত্মহিতে সর্বহিত।”

 ব্রাহ্ম সমাজের এক উৎসবের জন্য সরলা দেবী ‘হিন্দু-মুসলমান ঐক্য’ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যা প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয়ে এলাহবাদের ‘Hindusthan Review’-তে প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধে প্রভাবিত হয়ে লালা লাজপত রায় তাঁকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীনতার জন্য উগ্রপন্থী মতবাদের সমর্থক হলেও সরলাদেবী কখনোই অন্যায় অত্যাচার অবিচারকে প্রশ্রয় দিতে পারেননি। দেশের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে বাংলার কিছু যুবক পুনার গঙ্গাধর তিলকের নাম নিয়ে অসহায় মানুষদের হত্যা করতে চাইলে এর প্রতিবাদে সরলাদেবী একা তার সত্যাসত্য জানবার জন্য কলকাতা থেকে পুনায় গিয়ে তিলকজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং যুবকদের শেষ পর্যন্ত ডাকাতি ও হত্যা থেকে নিরস্ত্র করতে পেরেছিলেন।

 শিকাগো ধর্ম সম্মেলন থেকে ফেরবার পর স্টার থিয়েটারে স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া বক্তৃতা সম্পর্কে সরলা দেবী ভারতীতে একখানি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই সূত্রে বিবেকানন্দের পাঠানো পত্রের মাধ্যমে পরস্পরের পরিচয় ঘটে। এমন কয়েকটি পত্র বিনিময়ের পর স্বামীজীর দূতী হয়ে সিস্টার নিবেদিতা সরলা দেবীকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বেলুড় মঠে। মিসেস অলেবুল, মিস ম্যাকলাউড, স্বামী স্বরূপানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতার উপস্থিতিতে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতকার সরলাদেবীর জীবনকে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করেছিল। বিশেষ করে আশ্রমের সন্ন্যাসীদের সেবাভাব তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। ফলে দেশের মুক্তি সংগ্রামের থেকে দেশ-সেবাই তাঁর জীবনে শ্রেয় হয়ে উঠল। স্বামীজীর দেহাবসানের পর সরলা দেবীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। রাজযোগ, ভগবদ গীতা, বেদ, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও পুরাণ পাঠ করে হিন্দুত্বের সঠিক পরিভাষা জানার জন্য তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরিণামস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার পথ ত্যাগ করে সাকার দেবমূর্তিকে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি নিজের জীবনে।

 স্বামী বিবেকানন্দের মায়াবতী আশ্রমে গিয়ে শুভ্র হিমালয়ের বিশালতা ও সৌন্দর্যে সরলাদেবী মুগ্ধ হন। সেখানে থেকে স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে তিনি উপনিষদের অধ্যয়ন করেছিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের অদ্ভুত সমন্বয়। কৈলাস মানস সরোবর যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও মায়ের অসুস্থতা এবং নিজের বিবাহের জন্য তাঁকে ফিরে আসতে হয় হিমালয় থেকে। স্বর্ণকুমারী দেবী তখন বৈদ্যনাথে। সেখানেই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের বিখ্যাত আইনজীবী রাম্ভজ দত্তচৌধুরির সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ পর্যন্ত আত্মকথা লিখে সরলাদেবী তাঁর ‘জীবনের ঝরাপাতা’র সমাপ্তি টেনেছেন।

 সরলাদেবী তাঁর আত্মকথায় নিজের জীবন কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্ম উপাসনা পদ্ধতি, বিবাহ অনুষ্ঠান, জন্মতিথি পালন, ১১ মাঘের উৎসবের বর্ণনা, ছেলেমেয়েদের রহন-সহন, অন্তঃপুরের মেয়েদের গতিবিধি, শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সঙ্গীতচর্চা, ঠাকুরবাড়ির নাট্য অভিনয় প্রভৃতির নিখুঁত বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও মাদ্রাজের বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সমাজের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, হিন্দুবিবাহের বিভিন্ন দিক, পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেণিবিভাগ, কুঞ্জরুর প্রান্তের প্রাচীন ইতিহাস, পাঞ্জাবের কীর্তিগায়ক জাতি ‘মিরাসি’ প্রভৃতির প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন কখনও গল্পের আকারে আবার কখনও বা বিদগ্ধ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর আত্মজীবনীকে শুধুমাত্র তাঁর জীবনকথা বলা যায় না; তা সমগ্র সমকালের পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে সেখানকার সদস্য ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাদাম ব্লাভাটস্কি, কর্ণেল অলকট, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আশুতোষ চৌধুরী, লোকেন পালিত প্রমুখ ব্যক্তির সান্নিধ্যে প্রমুখ ব্যক্তির সান্নিধ্যে মাতুলালয়ে সরলা দেবীর জীবন গড়ে উঠেছিল। সেখান থেকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, বিচারের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার যে বোধে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং যা তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করেছিল তারই খণ্ডাংশ ‘জীবনের ঝরাপাতা’।

* জীবনের ঝরাপাতা, সরলাদেবী, রূপা পাব্‌লিকেশন, মূল্য ১৬ টাকা

**Aesthetic, social and mythic consciousness**

**in the poetry of Aurobindo Ghose and S.L.Peeran**

**MASHRIQUE JAHAN**

Research Scholar, Deptt. Of English

 B R A B University Muzafferpur

**Abstract**

This paper deals with Aesthetic, Social and Mythic consciousness in the poetry of Aurobindo Ghose and S.L.Peeran. This paper clarifies the fact that the contemporary poets too have the beauty and understanding for the poetry which could turn any stone to reach its height. Peeran has proved through his artistic beauty and knowledge of spiritual as well as social, aesthetic, mythic consciousness that poetry is not the only means of enjoyment but also a simple way to awareness. Aurobindo can be quoted to understand his spirituality, “… when the consciousness meets the supreme Reality or the spiritual reality of things and beings and has a contractual union with it, than the spark, the flash or the blaze of intimate truth perception is lit in its depths”

**Key words** – Aesthetic, Social and Mythic Consciousness, Spirituality, Sufi and Nature.

**Introduction:**

Indian English poetry is remarkably well known when it comes in term of aesthetic, social and mythic consciousness as Indian history and culture is very rich in itself. Indian poets do not hesitate to search their theme in the lap of Indian myths. Pre-independent, post- independent as well as contemporary Indian poets are also well known devotes and saints, their poetry emerges from their heart, the heart which only knows way to God.

This chapter is a benign effort to bring a contemporary poet S. L. Peeran infornt of a well pioneer Sri Aurobindo Ghose dealing both the poets poetry on the basis of aesthetic, mythic and social consciousness. Before coming to the two poets let us know what we understand by aesthetic mythic and social consciousness.

**Aesthetic consciousness**: aesthetic is traditionally regarded as a branch of philosophy concerned with the understanding of beauty and its manifestation in art and nature, nowadays it is also regarded as a phenomena of art and its place in human life, in other words it could also be said that aesthetic also involve the creator, the person experiencing and the art itself. Aesthetic consciousness generates from emotion, emotion is key to experience art in the way the artist intended his art to be perceived. A work of art, whether a painting, poem, play, etc, that has a dark and ominous tone seemingly inflicts an expression of an emotion upon the reader. Emotion is vital for any consciousness, without emotion one can not feel the real intention behind any particular piece of work. When one talk about aesthetic consciousness, it mean he or she can understand the emotion behind any work of art as he has experienced it in the light of inert knowledge.

**Social consciousness**: a poet can only be social if he could scarifies his whole for sake of his people, his readers and for humanity. When the reader reads any poem of a particular poet and he understands the emotion or pain or joy in the content of the poetry of that poet then he could be called as socially aware. When a poets talk about some social issue like inequality, human harassment, poverty, corruption etc the tone of his poem speaks his feeling and pain he is going through. Sometime it could also be seen in some poetry that it not only highlight some of the major issue which is engulfing our society but also show us with proper solution to follow, this relation and knowledge of a poet with his social surrounding makes him socially conscious.

**Mythic consciousness**: Indian English writing is full myths, poets dealing with myths color their writings in a very careful manner as they very well aware of the facts that readers faith are emotionally connected with it. Poets’ associated with myths writing also need proper knowledge of literally speech to give proper effect and judgment to their writings as his work acts like a bridge between myths and the reader which will enhance reader’s knowledge about myth and correct them through his writings.

Sri Aurobindo Ghose is a legend in Indian English writing, to compare Aurobindo with S.L.Peeran is not possible, this paper is only a benign effort to present the contemporary poets on a same pedal.

Multi-faceted Literary Dexterity, Shri Aurobindo Ghose was a revolutionary, a thinker, a writer, a play-wright, a poet and above all a seer. As a writer, he was considered as the ‘first and the foremost' as a poet. He created a massive output of poetry stretched over by a period of about seventy years.

Every hardship, every joy, every temptation is a challenge of the spirit that the human soul may prove itself. The great chain of necessity wherewith we are bound has divine significance and nothing happens which has not some service in working out the sublime destiny of the human soul. How could the world have attained its excellence if we has been denied the knowledge received through such benign soul.

As ‘a lovely, mystical lyric of great transparency.’ ‘Revelation’ has a visionary power. The poet experiences a spiritual illumination, as it were. For Aurobindo, nature very often becomes the abode of the heavenly spirit. Here also the poet envisions the presence of a spiritual creature amidst nature.

My breath runs in a subtle rhythmic stream;
It fills my members with a might divine:
I have drunk the Infinite like a giant’s wine.
Time is my drama or my pageant dream.
Now are my illumined cells joy’s flaming scheme
And changed my thrilled and branching nerves to fine
Channels of rapture opal and hyaline
For the influx of the Unknown and the Supreme.

I am no more a vassal of flesh,
A slave to Nature and her leaden rule;
I am caught no more in the senses’ narrow mesh.
My soul unhorizoned widens to measureless sight,
My body is God’s happy living tool,
My spirit a vast sun of deathless light1

Transformation is a mystical poem in which aurobindo speaks as an illuminined soul. The speaker is no longer a man of flash and bone; he has been transformed into God’s happy tool.’ His very soul is lip up with the rapture and joy of being a part of the unknown and the supreme. The poem captures the process of transformation that a spiritually enlightened person experience.

Aurobindo claims ‘Nature' as the abode of the heavenly spirit. In his poem Aurobindo elaborates behavior patterns and aptitudes, ideas and intentions and showed as the way of attaining purity of heart and sublimity of spirit. It was through the efforts of these God- moved souls that the cultural attainments were refined and embellished, the link between man and God, the slave and the lord, was established. He establishes the spiritual existence with the connotation – ‘a check of frightened rose' and ‘heavenly rout' reflects Spiritual World.

O Thou of whom I am the instrument,

O secret Spirit and Nature housed in me,

Let all my mortal being now be blent

In Thy still glory of divinity.

I have given my mind to be dug Thy channel mind,

I have offered up my will to be Thy will :

Let nothing of myself be left behind

In our union mystic and unutterable.

My heart shall throb with the world-beats of Thy 1ove;

My body become Thy engine for earth-use;

In my nerves and veins Thy rapture's streams shall move ;

My thoughts shall be hounds of Light for Thy power to loose.

Keep only my soul to adore eternally

And meet Thee in each form and soul of Thee.2

S. L. Peeran is an important figure in the contemporary Indian English Poetry, is a bilingual poet, writing both in English and Urdu. Although a late bloomer, who started writing poetry at the age of 48, yet has surprised the poetry world during the last ten years by presenting more than ten noteworthy volumes of poetry: *In Golden Times* (2000), *In Golden Moments*(2002), *A Search From Within*(2002), *A Ray of Light*(2002), *In Silient Moment(*2002), *A Call From Unknown*(2003), *New Frontiers*(2005), *Fountains of Hopes*(2006), *In Rare Moments*(2007), and *The Sacred Moments*(2008). *Glittering love*(2008), *Garden of Bliss*(2010), *Eternal Quest*(2012)

Peeran like Aurobindo Ghose depict on the fact that being on earth is no pleasurable experience. As Aurobindo discard earthly pleasure and says human body is a material one and it is the spirit that adds divinity to the same.

He who would bring the heavens here

Must descend himself into clay

And the burden of earthly nature bear

And tread the dolorous way.3

Likewise Peeran also in his poem “My Poem on Total Surrender” depict that the moment of being in the Divine Presence is the most joyous moment. It is the merger and union. This is what the Sufi yearns for. He wishes to be always in the company of Beloved in that Eternal Bliss and Supreme Love, which fills the Consciousness with Divinity, with Supreme Satisfaction and enlightenment. He loses his personal identity and attains Moksha in his own life by breaking the law of karma or rebirth. When light down there is enlightenment, the darkness disappears. The light eats away the darkness. There is glory and the fragrance spreads all over. Hence, the joy of the union and merger destroys the past regrets and future fears. A Sufi feels that his being is enveloped with his Lord’s compassion. He feels that each particle of his body is his Lord’s creation. He feels that his consciousness is merged with his Master’s and the Master’s consciousness dwells in him serenely and life glows in him sweetly and calmly. Songs flow from his lips in the pleasure of his Master’s love, which the Master showers on him eternally. A Sufi is totally a surrendered being.

 I love Him, Respect Him and honor Him;

Each breath of mine is spent in His service

Day and night, merge and I slave forever

Out of dedication and love of labor

Neither vagaries of weather, ill health

Nor desires, nor slumber can deter me

With deep devotion, I burn the candle

Of my life at His feet in total, surrender

I have no complaints, demands, compulsions

No grievances, grief or pain

Undoubtedly, I am captured by Him;

I am now left with no will of my own.

My Master’s service is my main motto

I wish I were a dog to befriend him.4

S. L. Peeran also chose his subject from Quran to make the reader aware of the truth that there is nothing but only path of truth which will lead them to Almighty god, his poem “Lord Ever Merciful and Beneficent” is a perfect example of this;

A command received by Adam and Eve,

Directly from the Lord Almighty

In the presence of archangels

Who protested creation of man from clay.

For they felt, they were part of the light

And fire, that could destroy man.

Lord Almighty taught Adam, His Names

And tested him, in presence of Angels,

Who were ever in obedient attendance.

Dumbfounded, they prostrated, seeking pardon.

Lo, their leader, Archangel, protested,

Defiant, out of jealousy, pride and pelf.

Refused to yield, cringe, cower before Adam.

On the pretext of his superiority and knowledge

On the premise that Adam’s race would create

Dissensions, destructions, bloodshed and sins.

An angel is pure, in total submission, to Lord

Should he bow before impure men of clay?

Thus Satan was banished, from Lord’s Grace.

To ever remain as an arch enemy of man.

To tempt, lure, lead him to commit sin,

To indulge in sinful, mirth, joy and pleasure.

To make man to hate man for destruction.

To covet the neighbor’s wife and to steal.

To commit heinous acts, to be shunned.

Neither pity nor mercy shall befall such men.

Thunder, lightning, storms and pestilence

Should ever pester them to shameless death.

To hell, they would be thrown by Lord’s wrath

This to punish, for befriending, Lord’s adversary, the villain

Who is a confirmed enemy of man.

The Lord, the Merciful and the Beneficent

Though has granted a decree and license

To Satan, to destroy, His creation.

To mislead humanity and lead them to cross roads.

But save those, who are in submission

In humility, serving humanity with sacrifice,

With love, devotion, serve their brethren

To save men from disarray and wrong paths,

Such shall receive Lord’s Grace, Mercy,

For Ever His door is open to receive them.5

Another poem “Peace within” of Peeran speaks about peace, which could only be achieved after several turmoil but once it is achieved

One has to undergo severe

Mental and physical sufferings

Agony and turmoil’s in life

Before arriving at the Truth

A testing time, a period

Of severe anguish and pain.

On arriving at the Truth

You reach the stream

Of fresh, soothing waters

To quench the thirst

To gain moments of

Ecstasy, joy and Supreme –

Bliss, to bring peace within

And enlighten the dark soul.6

Aurobindo has been represented as saga and philosopher who has plunged the secret of nature beyond the ken of perception and changed the concept of things and material.Aurobindo uses combination of abstract and concrete terms to invest the images with more abstract meaning without becoming overly abstract.

 Peeran’s poetry emerges from his heart, as poetry emanating from mind steeps in faith can sometimes be effective and enlightening and a restorer of truth and justice, but history of the world, however, been ample proof of the unprofitableness of such poets.

It could be said about Sri Aurobindo and S.L.Peeran that if one is a model of endurance, the other is a emblems of selflessness, sacrifice, fervor for truth and oneness of God, submission to the will of lord, chastity and piety. In short, each of them is a lighthouse of guidance showing the path of exalted behavior in one or the other walk of life.

**References:**

1. Prasad, Harimohan. *Indian Poetry in English*. Macmillan Publisher India Ltd, 2002. p. 17.
2. Aurobindo,s. *Collected poems*. Pondicherry, Aurobindo Ashram, 1972, p.611.
3. Ibid.,
4. Peeran, S.L. Journey of a Soul. Bizz Buzz Pulication.
5. Peeran, S.L. Journey of a Soul. Bizz Buzz Pulication, p.220-21.
6. Ibid.,p.236.
7. Hasan, Masoodul. Sufism & English Literature Chaucer to the Present Age: Eches & Image. New Delhi: Adam Publisher and Distribution, 2007
8. Hussain, S. Athar. *Prophet Mohammad and His Mission.* Lucknow: Academy of Islamic Research and Publication, 1967.

**Karmapa Lama and environmental Protection**

**Dr. Malvika Ranjan**

Associate Professor

Dept. of History, BHU

 Lord Buddha and earlier masters said a great deal about how we need to protect the environment, the forests, and the trees. But when we hear it, we just touch the text to our foreheads and say, "I go for refuge!" Eloquent and beautiful words often pass our lips: “May it be so! May there be benefit for all! May it happen! May this be for all sentient beings throughout space! May that be!” But we do not practice them in a meaningful way. We are still wandering in the ocean of samsaric suffering because our wishes and our actions go in opposite directions. If we continue in this way, we will remain in samsara forever. Please keep this in mind.’

 These words were spoken by Karmapa His Holiness Oygen Trinley Dorje, an environmental enthusiast in December 2008 .

 The [Karmapa](https://en.wikipedia.org/wiki/Karmapa) **Ogyen Trinley Dorje** is head of the [Karma Kagyu](https://en.wikipedia.org/wiki/Karma_Kagyu) school, one of the four main schools of [Tibetan Buddhism](https://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_Buddhism). Karmapa Lama is enthusiastically working in field of environmental awareness. Realizing the importance of environmental protection as propagated by His Holiness the Dalai Lama, the Karmapa has been giving instructions on the subject on various occasions. However, it was in 2007 that His Holiness began strongly advocating for environmental protection .

 At the 2007 ‘Kagyu Monlam’ in Bodh Gaya, His Holiness made environmental protection a priority and said that he would like to see practical results within the Kagyu community. He made a special request to his monasteries to plant 1,000 trees . He also encouraged the community of his followers around the world to take individual responsibility for protecting the environment in their own respective countries. In addition he urged monks to practise restraint when sponsors offer technology upgrades 1

Speaking in favour of vegetarianism in one of his sermons in 2007, He observed-

‘ During the 24th annual Great Kagyu Monlam, Bodhgaya, India Some people give up meat altogether, but some people cannot. But at least, one should reduce it. Because in the society, if everybody is eating meat then it is very difficult to give up meat, but if there is a society and the whole environment is not eating meat then it's easy not to eat meat. But if everyone is eating meat then it is not easy to stop eating meat. In the next session I will ask you, how many of you will eat meat for only one meal and not in the two other meals. So those who will do that, should raise you hands. I don't have to see all of them but you must make the promise to yourselves. Then [I'll ask] how many of you would like to give up meat on special days and how many of you would give up meat for all the time. So you have to think. [However], there's nothing much to think about. You just have to decide. Thinking too much is not really useful; you just have to decide. 2

 In 2008, His Holiness The Karmapa Lama brought forth the Environmental Guidelines for Kagyu Monasteries, Centers and Community. On doing so, he said "this booklet is but a small drop in a huge ocean. The challenge of environmental degradation is far more complex and extensive than anything we alone can tackle. However, if we can all contribute a single drop of clean water, those drops will accumulate into a fresh pond, then a clear stream and eventually a vast pure ocean. This is my aspiration."3

 The Second Conference on Environmental Protection for Kagyu Monasteries and Centres was held under the patronage of The Karmapa in Gyuto, Dharamshala in October 2009. This was attended by monks from34 monasteries. The monasteries which had set environmental goals had to submit their progress reports. . It was a learning experience for the participants , working in cooperation with local Dharamsala, and NGOs. They were able to see activities concerning water restoration, waste management and composting and so on. One of the major results of this workshop was an agreement among the attending monasteries to create an association of monasteries that are carrying out environmental projects. 4

. The credit of establishing Khoryug , in 2009 an organisation forging ahead in the field of environmental protection goes to The Karmapa Lama.. KHORYUG in Tibetan language means environment. It is a network of Buddhist monasteries and centers in the Himalayas jointly working  on environmental protection of the Himalayan region with the mission of practically applying the values of compassion and interdependence towards the Earth and all living beings . The aim of KHORYUG is to develop a partnership with community based organizations and NGOs wherever there is a member monastery or centre with a coordinated this organisation can achieve it purpose of protecting life on earth.5.”

Another very significant contribution of Karmapa was the launch of a written statement on the Earth Day in 2009, titled ONE HUNDRED AND EIGHT THINGS YOU CAN DO TO HELP THE ENVIRONMENT.6

Highlights of this statement were THE EIGHT STRATEGIES which each Buddhist monk of the Kagyu lineage was supposed to adopt. Regarding these eight strategies the Karmapa declared-

“1. Create a mandala of nature. It should be a special place in your monastic lands that is an offering of all the wonderful things in nature; flowers, trees, water; recognizing that the earth itself is an offering. This will be in keeping with our own Kagyu tradition . If you do not own enough land for such a project, please consider a rooftop garden.

 2. Monasteries and nunneries should create a vegetable garden. Another option is to build it with your local community on common lands. The result should be a healthy and environmentally friendly lifestyle.

 3. Don’t buy many vehicles. There is a trend right now that senior lamas should have a car but this is not necessary. Keep in mind how harmful vehicles are for the environment; they emit carbon and contribute to global warming greatly. Therefore, you should think twice about buying one.

 4. Reduce the use of plastic; whether it is bottled water or plastic wrapped fruit and sweets. In all cases, please make the effort to buy the option that has less packaging.

5. Do not waste food in kitchens and in dining halls.

 6. Vegetarians should differentiate between the different types of eggs that are available; fertilized, nonfertilized and cage-free. Even though we may not eat their meat, the hens that are used for laying eggs are mistreated and shoved in coops.

 7. Monasteries and nunneries should do their best to use solar and wind power and thus, reduce their dependence on harmful types of energy. There are many options in the Himalayas for solar and wind energy installations. Please take a closer look into the possibility.

 8. It is clear that forests are very important for all life on earth. All of you gathered here in this environmental conference have committed to planting 25 trees each this year. However, please don’t limit your efforts to this only and continue to protect and restore forests”

The 108 guidelines , covered every aspect of the environment

 **Karmapa Lama has also been enthusiastically promoting the issue of wild life protection It was in Dharamshala in July 2009, addressing the students of Tibetan Children’s village School , Karmapa said-**

"Animals are not our enemies. We are all interdependent; every animal has a role to play in the ecology by being a part of the food chain. If you remove one layer, the entire chain is affected. Even while talking in the interest of human beings, by saving wildlife, you are ultimately helping yourself," He further said-"From the Buddhist viewpoint, we say every sentient being is a mother sentient being. We believe in bringing no harm to others including animals, but the ground reality is that this is being neglected," said the Karmapa.7

 The Karmapa has also been collaborating with other leaders to promote the issue of wildlife protection. Recently in Jan 25,2014 animal rights activist Maneka Gandhi, participated in a campaign for animal healthcare . Maneka joined the campaign launched by the Kagyupa International Monlam Trust headed by Karmapa Lama.

Karmapa inaugurated the animal health camp at his Tregar Monastery in Bodh Gaya . The animal health camp, aimed at providing periodic health check-up and free treatment of the animals. The Monlam trust also decided to incorporate the plan involving sterilization of dogs . This was a major event in which enthusiastic civilians and monks took part and volunteered to help The Karmapa who is still continuing unabated his noble task of environmental protection. He reiterated his mission again in the sixth environmental protection seminar held by Khoryug in Dharamshala held in Nov13, 2015-

‘In order to save the Himalayas and Tibet from the threats of deforestation, climate change, and pollution, we have to be full of courage and believe whole heartedly that this endeavour is winnable. The alternative is unthinkable.”. The Karmapa 8

References-

1. .Retrieved from <[www.**kagyumonlam**.org/.../**2007**1227\_HHK\_Advice\_**Environment**.html](http://www.kagyumonlam.org/.../20071227_HHK_Advice_Environment.html).>
2. Ibid
3. Retrieved from<http://kagyumonlam.org/Download/TEXT/English%20Archana.pdf>
4. Retrieved from <http://www.khoryug.com/his-holiness-the-karmapa-leads-the-second-conference-on-environmental-protection-for-kagyu/>
5. Retrieved from <http://www.khoryug.com/vision/>
6. Retrieved from <http://www.arcworld.org/downloads/108-Things-to-Do-Karmapa.pdf>
7. Retrieved from<. <http://www.ens-newswire.com/ens/jul2009/2009-07-04-01.html>>
8. Retrieved from <<http://kagyuoffice.org/sixth-khoryug-conference-on-environmental-protection-for-tibetan-buddhist-monasteries-nunneries-in-the-himalayas/>>

**EFFECT OF POVERTY AND IGNORANCE ON THE POLLING OPINION OF THE PEOPLE**

 **Aiswarya Maity**

The Heritage School, Kolkata

Poverty and ignorance do have a great impact on the polling opinion of the people. In fact, we, the people, prefer giving our vote to the one who shows the most concern towards the poor. But, it is indeed very sad to know that most of the time, this concern is false.

 When a leader starts focusing on one particular group of people, another group of people starts to feel completely neglected. This also has an impact on that particular group of people, receiving attention. The actual point is that all people want attention from their leader. On the other hand, the people who are considered as ‘poor’ sometimes think that their vote will not make much a difference in the elections and the selection of their leader. But, they must be made to understand that in the elections, every single vote is equally important. As a matter of fact, majority population of India at present is below poverty line.

 People like voting for the leader or party which gives them the most attention. Ignorance can be like poison for a leader. A leading party or individual leader cannot afford to ignore anyone. Every small affair must come to the leader’s notice. In other words, a leader must have a hawk’s eye as well as a mouse’s ear. But sadly, most of the present leaders take advantage of these sensitive issues like poverty.

 Poor people and simpletons, see in their leader, a saviour, who will see to all their problems and difficulties, protect them and understand them. People also prefer a leader from a poor background, as they suppose them to understand and pay more heed to them. If a leader, by chance, pays less heed to a certain group of people, another party starts attempts on grabbing the attention of those people. This is the way leaders gain votes nowadays. These days, leaders, just before the elections, have taken up a policy of distributing sacks of rice, mobile phones and stacks of money among the poor. This makes the poor think that that leader will help their families. But, most of the time, after getting votes of hope from these people, the leaders get indulged into their own selfish business, shattering the people’s hope. They do not even look back towards that same poor family who were finally being able to bring a happier life into sight.

 People also tend to vote for that person who helps the less-privileged section of the society. In our society, we still have a group of people who are often ignored. They prefer a leader who will punish those who ignore them. So, overall, factors like poverty and ignorance in our society can drive the polling opinion of the people, in a totally different direction. They can steer the direction of a finger flickering over an electronic voting machine (EVM) from one button to another.